বিশ্বরূপা

প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহালয়া
আশ্বিন, ১৩৫৪

মুদ্রাকর—
শ্রীমণীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জী.
মুখার্জ্জী প্রেস
৫এ, নূরমহম্মদ লেন, কলিকাতা।

বিশ্বরূপা

সম্পাদক—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

সূচীপত্র

চিত্রসূচী



নতুন পুতুল

বিশ্বরূপা

সুদীর্ঘ কালের কঠোর তপস্যার ফলে ভারত আজ পরাধীনতার গ্লানি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। জীবনের জয়গানে আজ তাহার আকাশ বাতাস মুখরিত। স্বাধীনতার যাদুদণ্ড স্পর্শে আমরা দুই শতাব্দীর বেদনাময় স্মৃতি ভুলিতে পারিয়াছি। বিশ্বের কেহ আজ আর আমাদের শত্রু নহে। আজ আমাদের প্রকৃত আনন্দের দিন।

কিন্তু এই আনন্দে আত্মহারা হইলে আমাদের চলিবে না। ভারতের এখন 'দীন ভিখারীর বেশ'। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, চারিদিকে শুধু অজ্ঞানের অন্ধকার। দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি-প্রপীড়িত স্বদেশবাসীকে রক্ষা করিবে কে? যে চিরাকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আজ আমরা পাইলাম তাহার আনন্দ হইতে যদি আমাদের 'মূঢ় ম্লান মূক' স্বদেশবাসী বঞ্চিত হয় তবে এই স্বাধীনতা হইবে নির্মম পরিহাস। কিন্তু দেশকে নবজীবন দানের এই কঠোর কর্ত্তব্য গ্রহণ করিবে কাহারা?

যে সকল অক্লান্ত কর্ম্মী মরণ বিজয়ী বীর যোদ্ধা তাহাদের অপরিসীম ত্যাগের দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ দুস্তর গহন প্রান্তর হইতে দেশবাসীকে স্বাধীনতার রাজপথে আনিয়া স্থান দিলেন, পথ চলিবার দায়িত্বও কি তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে? কোন প্রকার দায়িত্ব ভারেই তাঁহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত নহেন ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব বাড়িবে না। এ কর্ত্তব্যের ভার আমাদিগকেও বহন করিতে হইবে,—পুণ্য ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা আজ মুকুল, ভবিষ্যৎ মহীরুহের বীজ তাহাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে; চাই শুধু সযত্ন লালনপালন। আমাদের কিশোর কিশোরীরা যাহাতে ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল নাগরিক হইয়া ভারতকে পুনরায় জগৎ সভায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে তাহার উপযুক্ত পরিবেশ এখন হইতেই প্রস্তুত করিতে হইবে। পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নিছক ছেলে-ভুলানো ছাড়া অথবা আপাত-চিত্তহরণকারী অসার কাহিনীর মায়াজালে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। বিশ্বের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাহিনী, অর্থাৎ বর্ত্তমান 'বিশ্বের রূপ' সমগ্রভাবে যাহাতে সর্ব্বদা তাহাদের অন্তরে প্রতিফলিত

হইয়া নবভারতকে মহান্ করিবার প্রেরণা তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

'বিশ্বরূপা' এই মহান্ কর্ত্তব্যের অংশ গ্রহণ করিতে চাহে। ইহা অনেকটা স্পর্দ্ধার মত শুনাইলেও যে সকল প্রখ্যাতনামা 'বিশ্বরূপা'কে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন তাহাদের সাহায্য ও শুভ-ইচ্ছায় 'বিশ্বরূপা' তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে এই কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়া যাইবার আশা রাখে।

'বিশ্বরূপা' বর্ত্তমানে সঙ্কলন গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হইল। আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহাকে মাসিক পত্রিকার রূপ দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

ইন্দোনেসিয়া

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইন্দোনেসিয়ার নাম আজকাল প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখা যায়—ইন্দোনেসিয়া দেশের লোকেরা নিজেদের স্বাধীন ব'লে ঘোষণা ক'রে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র চালাচ্ছে, কিন্তু ঐ দেশের লোকেদের উপরে এতদিন ধ'রে ডচ্ বা ওলন্দাজরা যে মোড়লী ক'রছিল, তা তারা ছাড়তে চায় না ব'লে, ডচেরা এখন নানা রকমের ইতরামি ক'র্‌ছে, গায়ের জোরে আবার ইন্দোনেসিয়ার লোকেদের নিজেদের অধীনে আন্‌তে চায়—বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সালিসী ডচেরা কিছুতেই মান্‌বে না। আজকাল এই খবরটাই বেশী ক'রে আমরা পাচ্ছি। ইন্দোনেসিয়ার জননেতা ডাক্তার সুকর্ণ, ডাক্তার হাত্তা, আমীর শরফুদ্দীন, ডাক্তার সুমিত্র, ডাক্তার শারীর, সেনাপতি সুদর্শনো—এঁদের নামের সঙ্গে, প্রত্যেক ভারতবাসী যে খবরের কাগজ পড়ে, সে পরিচিত—এঁদের প্রায় সবাই ভারতবর্ষে এসে ঘুরে গিয়েছেন, এঁরা যেন এখন আমাদের আপনার লোকই হ'য়ে গিয়েছেন। খবরের কাগজে ইন্দোনেসিয়ার সম্বন্ধে এতটা হৈ-চৈ হ'লেও, ভূগোলের বইয়ে কিন্তু এখনও ইন্দোনেসিয়ার নাম ওঠেনি। ভূগোলের সব চেয়ে ভাল পড়িয়ে' কোনও ছাত্র, যে খবরের কাগজ বা পত্র-পত্রিকা পড়ে না, দুনিয়ার

সম্বন্ধে ওয়াকিফ হাল নয়, ইন্দোনেসিয়া কি, আর কোথায়, তা সে ব'ল্‌তে পারবে না। এর কারণ হ'চ্ছে,—দেশটী তো বরাবরই আছে, আর দেশের লোকেরাও আছে, কিন্তু সমগ্র ভাবে দেশের যে নাম ছিল তা দেশের অধিবাসীদের পক্ষে গৌরবের বস্তু ছিল না; সেইজন্যে, গত যুদ্ধের ফলে যখন দেশের বিদেশী শাসক ডচেরা জাপানীদের হাতে হেরে পালাল, তখন দেশের লোকেরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রলে, অনুষ্ঠানিক ভাবে দেশের নাম পুরোপুরি ব'দ্‌লে দিলে, নিজেরা স্বাধীন হ'ল। ভারতবর্ষের পূর্বে হ'চ্ছে বর্মা; বর্মার পূর্বে—শ্যামদেশ; আর শ্যামদেশের পূর্বে ফরাসীদের অধিকৃত ইন্দো-চীন দেশ, সেখানকার লোকেরা Viet-nam "ভিয়েৎ-নাম্‌" এই নাম নিয়ে, নিজেদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করবার জন্য ইন্দোনেসীয়দের মতোই এখন প্রাণপণে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ল'ড়্‌ছে। বর্মা আর শ্যামের দক্ষিণে মালয়-উপদ্বীপ—এই অঞ্চলটা এখনও ইংরেজদের কবজায় র'য়েছে। মালয়-উপদ্বীপের পায়ের তলায়, অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পর্যন্ত, পূর্ব আর পশ্চিম জুড়ে যে দ্বীপমালা আছে, মিলিত ভাবে সেই দ্বীপমালার নোতুন নাম এখন দেওয়া হ'য়েছে, Indonesia 'ইন্দোনেসিয়া'। এই ইন্দোনেসিয়ার বাইরে পড়ে, পূর্বের New Guinea নিউ-গিনি ব'লে বড় দ্বীপটা, আর উত্তরে Philippine ফিলিপ্পীন দ্বীপপুঞ্জ। আগে এই দ্বীপাবলীর নাম ইংরেজীতে ছিল Islands of the Indian Archipelago, অথবা The East Indies। দেশটী Netherland নেদরলাণ্ড

বা Holland হলাণ্ড-বাসী ডচ্ বা ওলন্দাজদের অধীন ব'লে, এর অন্য নাম হচ্ছে Dutch East Indies; ডচেরা এই দ্বীপগুলিকে তাদের পৈতৃক জমীদারী রূপেই দেখ্ত—ইংরেজরা তাদের অধীন দেশ ব'লে জাহির করবার জন্য যেমন আমাদের দেশকে British India ব'ল্ত, তেমনি ডচেরা এই দ্বীপপুঞ্জকে নিজেদের ভাষায় ব'ল্ত—আর এখনও ব'ল্তে চায়—Nederlandsch Indie; ইংরেজেরা এর অনুবাদ ক'রে নিয়েছে Netherlands India.

দেশের অর্থাৎ এই দ্বীপময় দেশের পুরাতন এই নামগুলিতে, আর নূতন নাম Indonesia তে, India বা ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ সুস্পষ্ট। এই দ্বীপময় দেশে Sumatra সুমাত্রা, Java জাভা বা যবদ্বীপ, Borneo বোর্ণিও, Celebes সেলেবেস্, এই কয়টী বেশ বড় বড় দ্বীপ আছে; আবার তা ছাড়া Banka বাঙ্কা, Mentawei মেন্তাওয়েই, Madura মদুরা, Bali বলী, Lombok লম্বক, Sumbawa সুম্বাওয়া, Flores ফ্লোরেস্, Sumba সুম্বা, Timor তিমোর, Molucca মলক্কা, Halmahera হাল্মাহেরা, Buru বুরু, Serang সেরাঙ্, প্রভৃতি কতকগুলি মাঝারী বা ছোট, আর তা ছাড়া অনেকগুলি আরও ছোট আকারের দ্বীপ আছে।

এই দ্বীপাবলীতে মোটামুটি একই মানব-জনের অন্তর্ভুক্ত জাতির লোক বাস করে। এরা চেহারায় কতকটা চীনাদের মতো, কতকটা আবার ভারতবাসীদের মতো; এই জাতিকে

মোটা কথায় Malay মালয়-জাতি বলে। মালয়-জাতির নানা শাখা। এদের ভাষা এখন আর এক নেই, নানা প্রশাখায় এরা বিভক্ত হ'য়ে প'ড়েছে। আমাদের সংস্কৃত থেকে যেমন উত্তর-ভারতের আর্য্য-গোষ্ঠীর নানা ভাষার উদ্ভব হ'য়েছে, উৎপত্তি ধ'রে বাঙলা, উড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিকে যেমন পরস্পরের বোন ব'লতে হয়, ঠিক তেমনি, অধুনা-লুপ্ত এক আদিম মালয় ভাষা থেকে দ্বীপ-পুঞ্জের নানা দ্বীপের আধুনা-প্রচলিত ভাষাগুলির উদ্ভব হ'য়েছে; Malay মালয়, Sundanese সুন্দানী, Javanese যবদ্বীপীয়, Madurese মদুরী, Balinese বলিদ্বীপীয়, Sassak সাসাক, Minahasa মিনাহাসা, Mentawei মেন্তাওয়েই, Batak বাতাক প্রভৃতি ভাষাগুলি আর ফিলিপ্পীনের Visayan বিষয়া, Tagalog তাগালোগ্ প্রভৃতি নানা ভাষা, পরস্পরের সঙ্গে ভগিনী-সম্পর্কে গ্রথিত। মালয়-গোষ্ঠীর ভাষাগুলি আমাদের দেশের কোল শ্রেণীর ভাষা (যেমন সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুর্কু, জুয়াঙ্, গদব, শবর) আর আসামের খাসিয়া ভাষার সঙ্গে মেলে। কোল ভাষা, খাসিয়া, বর্মা আর ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীনের কতকগুলি ভাষা (এগুলির মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে দক্ষিণ-বর্মার Mon মোন্ বা Talaing তালৈঙ্ ভাষা, কম্বোজের ভাষা Khmer খ্মের, আর চম্পা বা কোচিন-চীনের ভাষা Cham চাম) একদিকে, আর অন্যদিকে হ'চ্ছে সমগ্র ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এই মালয় বা ইন্দোনেসীয় ভাষাগুলি, আর ইন্দোনেসিয়ার পূর্বে প্রশান্ত

মহাসাগরের মধ্যে আর যে-সব ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ আছে, যেগুলিকে Melanesia মেলানেসিয়ার অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বীপপুঞ্জের আর Polynesia পলিনেসিয়ার অর্থাৎ বহু দ্বীপ-পুঞ্জের দ্বীপ বলা হয়, সেখানকার অধিবাসীরা যে-সব ভাষা বলে সেগুলি ; এই দুই দিক্‌কার ভাষা, কয়েক হাজার বছর আগে, ভারতবর্ষে Austric অষ্ট্রিক বা 'দক্ষিণ দেশের ভাষা' ব'লে যে একটী অনার্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল ব'লে অনুমান হয়, সেই আদি অষ্ট্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে। আদি অষ্ট্রিক-ভাষী লোকেরা পূর্বের দেশ বর্মা, ইন্দোচীন, মালয়-দেশ, আর তারপরে ইন্দোনেসিয়া আর তার পূর্বের দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে' পড়ে, সে এখন থেকে কম-সে-কম আড়াই হাজার তিন হাজার বছর, কি আরও আগেকার কথা। ভারতের বাইরে ঐ-সব দেশে গিয়ে, এরা স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে, আর ঐ-সব দেশে পরে যারা এসেছিল এমন নানা জাতের লোকের সঙ্গে মিশে গিয়ে, এখন মোন্, খ্মের, চাম, মালয় বা ইন্দোনেসীয়, মেলানেসীয়, পলিনেসীয় প্রভৃতি জাতির মানুষে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গিয়েছে।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা ইন্দোনেসিয়ার লোকেরা, যারা ডচ্‌দের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা ক'র্‌ছে, তারা হ'চ্ছে সংখ্যায় প্রায় পাঁচ কোটি। এই পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে বেশীর ভাগই মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে থেকেই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু) ধর্ম আর বৌদ্ধ ধর্ম বেশ প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবার পরে, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু বণিক্

আর তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর পণ্ডিত, আর বৌদ্ধ ভিক্ষু ; আর তা ছাড়া নানা কাজের সব শিল্পী, ও-সব দেশে যেতে আরম্ভ করে। স্থানীয় লোকেদের সভ্যতা খুব উঁচু স্তরের ছিল না ; সত্য কথা ব'ল্‌তে সভ্যতা ব'লে একটা কিছুই তাদের ছিল না। তারা অতি সহজে আর আনন্দের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা আর ধর্ম গ্রহণ করে, ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগ হয়। ও দেশের লোকেরা শিব উমা বিষ্ণু শ্রী গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবী, হিন্দুর পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান, হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্র (বিশেষ করে রামায়ণ আর মহাভারত আর পুরাণ আর তন্ত্র) মহাযান মতের বৌদ্ধ ধর্ম অবলোকিতেশ্বর তারা মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতা, আর বৌদ্ধ শাস্ত্র—এ-সব আগ্রহের সঙ্গে নেয়, নিয়ে নিজের করে ফেলে ; হিন্দুর দর্শন ও চিন্তা এদের দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তোলে, এরা পুরোপুরি হিন্দুই হ'য়ে যায়। এদের দেশ এক সত্যকার নবীন ভারতবর্ষ, দ্বীপপুঞ্জের ভারতবর্ষ, বা "দ্বীপময়" ভারতে পরিণত হয়। সংস্কৃত ভাষা এদের দেশের পণ্ডিতে আর শিক্ষিত লোকে চর্চ্চা ক'র্‌ত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ আর তার অনুকরণকে আশ্রয় ক'রে, এখন থেকে এক হাজার বছর আগে থেকেই, এদের মধ্যকার একটী প্রধান ভাষা যবদ্বীপীয় ভাষাতে নোতুন ক'রে বড় দরের একটী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় বর্ণমালা দক্ষিণ ভারত থেকে যা ওদের কাছে পৌঁচেছিল তা ওরা নিজেদের ভাষার জন্য নিয়েছে। এই ভাবে, দ্বীপগুলিতে এক "বৃহত্তর" ভারতের প্রতিষ্ঠা হয়। দেশের রাজারা ভারতবর্ষের

মতই সংস্কৃত ভাষাতে নিজেদের অনুশাসন, দান-পত্র, সব লিখতেন বা লেখাতেন—ঠিক প্রাচীন আর মধ্যযুগের ভারতে যেমনটী হ'ত ; আর যবদ্বীপের ভাষা আর সুন্দানী, মদুরী, বলিদ্বীপীয় ভাষা, মালয় ভাষা—এগুলি, তমিল, তেলুগু, মালয়ালম প্রভৃতি ভারতবর্ষের দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মতোই, সংস্কৃত শব্দে ভরপূর। রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে অতি সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই নামে বড় বড় সংস্কৃত শব্দ আসৃত ; বিশেষ ক'রে যবদ্বীপে এই ব্যাপারটী এখনও পর্য্যন্ত দেখা যায়। এদের প্রাচীন কতকগুলি রাজা আর রাণীর নাম—"পূর্ণবর্মা (৪০০ খ্রীষ্টাব্দ), বলপুত্রদেব (খ্রীষ্টাব্দ ৮৮৮), ধর্মবংশ (১০০০ খ্রীষ্টাব্দ), জয়াভয় (১১র শতক), বিষ্ণুবর্দ্ধন (১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ), জয়বর্দ্ধন (১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ), জয়নগর ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দ), ত্রিভুবনদেবী সুহিতা, ও গায়ত্রী দেবী (১৩৪০ খ্রীস্টাব্দ), গজমদ, বিখ্যাত মন্ত্রী (১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ)" প্রভৃতি। এরা এখন ধর্মে বেশীর ভাগ মুসলমান হ'য়ে গেলেও, আর মুসলমান ব'লে আরবী ভাষার নাম নেওয়ার রীতি কিছু-কিছু এদের মধ্যে এখন এসে প'ড়লেও, এখনও পর্য্যন্ত বড় বড় সংস্কৃত নাম এদের পূর্বপুরুষদের মতো এরা নিয়ে থাকে। যেমন—"কুসুমায়ুধ, সূর্য্য-প্রণত, শাস্ত্রবিদগ্ধ, আর্য্যসুপ্রাজ্ঞ, সুদর্শনো, জয়বিনীত, সহস্রকুসুম, গন্ধকুসুম, শাস্ত্রাধিবিনীত, কুসুমবর্দ্ধনী," ইত্যাদি ; এ ছাড়া, নিজেদের ভাষার কথা আর সংস্কৃত কথা দুই মিলিয়ে' তো অনেক নাম আছেই। দেশের পাহাড় পর্বত নদনদী নগর গ্রামের নামও সংস্কৃত-বহুল ; যেমন, "ব্রহ্মগিরি, সুমেরুগিরি, কালা নদী,

অযোধ্যাকৃত (যা এখন এদের মুখে 'জোগ্যাকর্ত' রূপে শোনা যায়), শূর্‌কৃত, সুখভূমি, সিংহরাজা" প্রভৃতি।

দেশটী বরাবরই হিন্দুর দেশ ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের শেষভাগে থেকে, ঐ দেশে আরব মুসলমান বণিক্ আর সঙ্গে সঙ্গে যে-সব ভারতীয় বণিক্ ভারতবর্ষেই সমাজ-গত ভাবে ইস্লাম ধর্ম নিয়েছিল, তাদের সহযোগিতায়, স্থানীয় লোকেদের মধ্যে মুসলমান ধর্মের প্রসার হ'তে থাকে। একজন যবদ্বীপীয় হিন্দু রাজা এক আরব মুসলমান ধর্ম প্রচারকের বোনকে বিয়ে করেন, ক'রে নিজেও মুসলমান হন। এই রাজাকে আর তাঁর রাজ্যকে আশ্রয় ক'রে, মুসলমান ধর্ম প্রসার লাভ ক'র্‌তে থাকে। তারপরে যবদ্বীপের হিন্দু রাজাদের মধ্যে একতার অভাবের আর অন্য নানা দৌর্বল্যের ফলে, একে একে সমস্ত যবদ্বীপীয় রাজ্যগুলি মুসলমান আরব ও মুসলমান যবদ্বীপীয়দের দ্বারা বিজিত হ'ল; পূর্ব যবদ্বীপে শেষ হিন্দুরাজ্য মজ-পহিৎ বা বিল্ব-তিক্ত, ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে অধিকৃত হ'ল—রাজ্য-শাসনের ক্ষেত্রে যবদ্বীপে হিন্দু-যুগের অবসান ঘ'ট্‌ল। বহু যবদ্বীপীয় রাজবংশের লোক আর অভিজাত-বর্গ, আর অন্য বহু সাধারণ লোক, যারা মুসলমান ধর্ম নিতে চাইলে না, তারা যবদ্বীপের পূর্বে অবস্থিত বলিদ্বীপে পালিয়ে' গিয়ে আশ্রয় নিলে; বলিদ্বীপের লোকেরা এখনও হিন্দু আছে, আর সেখানে শতকরা ৯৫ জনের বেশী হ'চ্ছে হিন্দু।

খ্রীষ্টীয় ষোলোর শতক থেকে পোর্তুগীজ আর স্পানীয় লোকেরা জাহাজে ক'রে এসে দ্বীপময় ভারত ঘুরে যায়; তারপরে

ওলন্দাজেরা এই-সব দেশের এলাচ, মরিচ, জায়ফল, দারুচিনি প্রভৃতি গরম মশলার সন্ধানে ব্যবসায়-সূত্রে এসে হাজির হয়; আর পরে ডচেরা ধীরে ধীরে সারা দ্বীপগুলিতে নিজেদের রাজ্য জমিয়ে' বসে—এখন থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে। তারপরে, এত দিন ধ'রে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ডচেরা এই দেশে রাজত্ব ক'রে আস্‌ছে; তার ফলে, দেশের ধন-সম্পদের শোষণ, আর দেশের লোকেদের মানসিক আর আধ্যাত্মিক অবনতি। ঠিক আমাদের দেশে ইংরেজদের আমলে যেমনটা চ'লছিল। এই শতকের গোড়া থেকে, ইন্দোনেসিয়ার শিক্ষিত আর বুদ্ধিমান্ লোকেরা ডচ শাসনের কুফল সম্বন্ধে সচেতন হ'তে থাকে, আর ডচ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। কাজেই, এরা সাম্রাজ্য-তান্ত্রিক শোষণ-ধর্মী পরপীড়ক বিদেশী ডচেদের চক্ষু-শূল হ'য়ে পড়ে—আমাদের ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনে জাতীয়তাবাদীদের যে অবস্থা ছিল, ইন্দোনেসিয়ার লোকেদেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়।

সমগ্র দ্বীপাবলীতে নানান্ ভাষা, বিভিন্ন সাহিত্য—যদিও এই ভাষাগুলি একই গোষ্ঠীর ব'লে এদের পরস্পরের মধ্যে খুবই মিল আছে; কিন্তু মালয় ভাষা, যেটী মূলতঃ সুমাত্রা আর মালয়-উপদ্বীপের ভাষা, সেটী আমাদের উত্তর-ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষা যেমন, তেমনি বিশেষ-ভাবে প্রচলিত, এটীই হ'চ্ছে দ্বীপময় ভারতের বা ইন্দোনেসিয়ার রাষ্ট্রভাষা। এই মালয় ভাষা রোমান অক্ষরে ডচ ভাষার বানান অনুসারে লিখিত হয়; আর যবদ্বীপীয়, বলিদ্বীপীয়, মদুরী, সুন্দানী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা যারা বলে,

এমন ইন্দোনেসীয় দেশনায়ক আর দেশভক্তেরা এই রোমান-মালয়কেই নূতন ইন্দোনেসীয় স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন। দেশের জন্য ওলন্দাজদের দেওয়া নাম Nederlandsch Indie এদের কাছে অপমান-জনক বোধ হয়; তাই এরা, ডচদের প্রবল আপত্তি আর বাধা সত্ত্বেও, সমগ্র দ্বীপময় ভারতের দ্বীপপুঞ্জের জন্যে Indonesia এই নোতুন নামটী নিয়েছে; এই নাম, আশা করা যায়, এখন চিরস্থায়ী আর দেশবিদেশে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখনীয় হবে। Indonesia এই শব্দটী, 'ভারত বা ভারতবাসী' অর্থে গ্রীক শব্দ Indos, আর 'দ্বীপ' অর্থে গ্রীক শব্দ nesos, এই দুটী শব্দ মিলিয়ে' তৈরী হ'য়েছে—Indonesia নামটীর দ্বারায় যেন দ্যোতনা বা ইঙ্গিত করা হ'চ্ছে এই যে, এমন একটী দেশ বা রাষ্ট্র, যেটী অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে গঠিত হ'য়েছে আর যেখানে ভারতের সংস্কৃতি প্রসার লাভ ক'রেছে, যে দ্বীপের দেশ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত। নামটী খুবই সার্থক। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গে, ভারতীয় আমরা, আমাদের যে নাড়ীর যোগ আছে, তাও প্রচারিত হ'চ্ছে এই নামের দ্বারায়। এদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম যে মূলে ভারতীয়, সে কথা বিশেষ করিয়ে' জানাবার জন্য এই Indonesia নামটী, গত খ্রীষ্টীয় শতকের আশীর কোঠায় একজন জরমান্ পণ্ডিত, যাঁর নাম ছিল A. Bastian বাস্তিয়ান, তিনি গ্রীক শব্দ দুটী মিলিয়ে', Melanesia, Polynesia আর Micronesia শব্দগুলির নজীরে তৈরী করেন; আর ইন্দোনেসিয়ার স্থানীয়

শিক্ষিত লোকেরা, ভারতের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা ভুল্‌তে চায় না ব'লেই, নিজেদের দেশের নাম ব'লে Indonesia আর নিজেদের জাতের নাম ব'লে Indonesian (অথবা, মালয় ভাষায় Orang Indonesia অর্থাৎ 'ইন্দোনেসিয়ার মানুষ', বা Boemipoetra Indonesia অর্থাৎ 'ইন্দোনেসিয়ার ভূমিপুত্র বা আদিবাসী') শব্দ কয়টী খুব স্ফূর্তির সঙ্গে ব্যবহার ক'র্‌ছে।

ইন্দোনেসিয়ার লোকেরা ধর্মে এখন বেশীর ভাগ মুসলমান; এরা হজ বা তীর্থ ক'র্‌তে আরবদেশে মক্কায় মদীনায় খুবই যায়; কিন্তু এদের প্রাচীন ভারতীয়-মূলক ইন্দোনেসীয় সংস্কৃতি এরা এখনও ভোলেনি, এরা আগ্রহের সঙ্গে এখনও রামায়ণ মহাভারত নিয়ে গান করে, অভিনয় করে। বিশেষ এক ধরণের মুসলমানী গোঁড়ামী, যা হ'চ্ছে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান সকলেরই পক্ষেই অভিশাপ-স্বরূপ তা থেকে ইন্দোনেসীয়েরা একেবারে মুক্ত। এই গোঁড়ামী হ'চ্ছে এই যে—ভগবানের রাজ্যে, মানুষকে, ঈশ্বরের খাস তালুকের পিয়ারা প্রজা মুসলমান, আর ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত অ-মুসলমান—এই দুই শাখায় ভাগ ক'রে, ঈশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আরোপ করে। এ ধরণের গোঁড়া মতের লোকেরা মুসলমান ব'লেই তারা ভগবানের চোখে বিশেষভাবে অনুগৃহীত, এই মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এ রকম মনোভাব অবশ্য শ্রেষ্ঠ মুসলমান চিন্তার অনুমোদিত মোটেই নয়। তাই, ইন্দোনেসিয়ার Constitution বা রাষ্ট্র-বিধানে চমৎকার কথা একটী বলা হ'য়েছে—The Republic of Indonesia is based on a Faith in the God of All Man-kind (অর্থাৎ সমগ্র মানব-জাতির ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের উপরে ইন্দোনেসিয়ার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত); এই মস্ত বড় কথাটীর জন্যই, আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি—ইন্দোনেসিয়ার জয় হোক্‌॥

আমরা ছাত্র

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

আমরা ছাত্র, মোদের তীর্থ নহেকো প্রয়াগ, কাশী
এই বাণী-পীঠে চিত্ত মোদের হয়েছে তীর্থবাসী।
এ পীঠ ধরেনি কোন সতী-দেহ
পুরাণে এ নাম পড়েনিকো কেহ—
তবু এ তীর্থে দলে দলে মিলে জ্ঞানের পিয়াসী আসি।

আমরা ভিক্ষু ;—বুদ্ধ-বেদীতে জ্বেলেছি জ্ঞানের বাতি
চক্ষে ফলকে তক্ষঃশীলার লুপ্ত গরিমা ভাতি।
এই আমাদেরি কেহ কে'বা জানে
হয়ত সফল করিবে সে ধ্যানে
দীপঙ্করের মত দীপ জ্বালি' জাগায়ে জগতবাসী।

আমরা বাণীর হংস বলাকা, অসীমের পানে মেলিয়াছি পাখা,
যাত্রার পথে প্রভাত সূর্য্য ছড়ায় কিরণ রাশি ;
কালের সায়রে ডুবিবে সূর্য্য
বাজায়ে আলোর বিদায় তূর্য্য
ডুবিবে না তবু পাখার শব্দ জেগে র'বে অবিনাশী॥

—

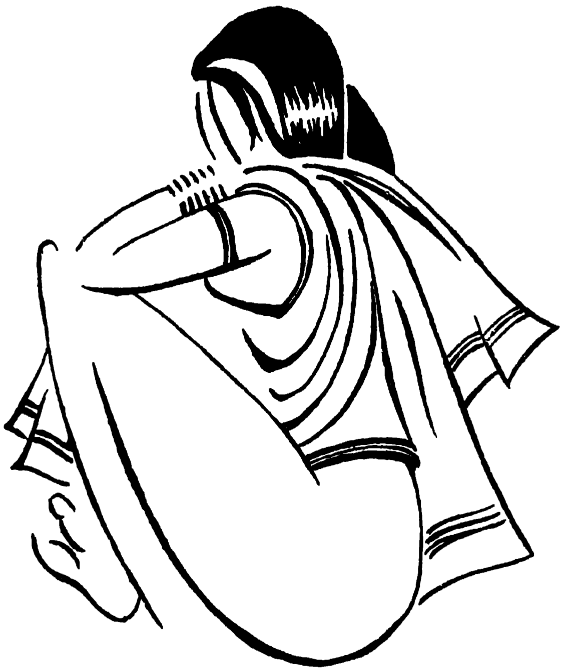
রায় বাহাদুরের আলেখ্য

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ

রায় বাহাদুর হরিহর মুখোপাধ্যায় সকাল বেলা চা-পান শেষ করিয়া উঠি উঠি করিতেছেন এমন সময় তাঁহার মেম-সাহেব অর্থাৎ হরিহর গিন্নী বলিয়া উঠিলেন "তোমার ঐ ছবি ওখান থেকে সরাও বল্‌ছি, নইলে দেখবে আমাকে কোন দিন রাঁচি পাঠানর ব্যবস্থা করতে হবে।"

মানসিক বিকারগ্রস্ত লোককে রাঁচিতে পাঠান হয় চিকিৎসার জন্য। রায় বাহাদুরের গৃহিণী রাগতভাবে যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে, যে ছবিখানার কথা বলিতেছেন, সে ছবিখানা যেখানে আছে সেখান হইতে সরাইয়া অন্যত্র রাখা প্রয়োজন। ওখানে থাকিলে সর্ব্বদা ঐ ছবি তাহাকে বাধ্য হইয়া দেখিতে হয়। ছবিখানা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না, বরং এতই গরপছন্দ করেন যে উহা দেখিলে তাহার মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হয়। তিনি পাগল হইয়া যাইবেন—তাঁহাকে শেষে রাঁচি পাঠাইতে হইবে।

যে ছবি সম্বন্ধে রায় বাহাদুরের মেম-সাহেব উক্ত মন্তব্য করিলেন সেখানা রায় বাহাদুরের নিজের প্রতিকৃতি। প্রকাণ্ড তেল-রঙ্গে আঁকা চিত্র হলঘরে টাঙ্গান ছিল। উক্ত ছবির এক নাতিবৃহৎ ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসকে স্বয়ং রায় বাহাদুরের ইতিহাস বলা চলে।



ভাবনা

ছোট সহরটায় তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। কেননা একাধারে তিনি রায় বাহাদুর, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান আরও কতকিছু। গত দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি লাফে লাফে উন্নতির চূড়ায় উঠিয়াছেন। আরম্ভে ঠিকাদারি কাজ করিতেন। পরে যুদ্ধের বাজারে কন্‌ট্রাক্‌টারি ফাঁদিয়া বসিলেন। ইহাতেই তাঁহার অদৃষ্ট খুলিয়া গেল। প্রচুর টাকা আসিতে লাগিল। এই টাকা সদ্ভাবে উপার্জ্জিত বা অসদ্ভাবে উপার্জ্জিত সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল। কেননা তাহাতে আমাদের এই গল্পের কিছু আসিয়া যায় না।

মুখিজ্জে মহাশয় বুদ্ধিমান লোক। টাকা উপার্জ্জন করিয়া ব্যয়ও কিছু করিয়াছিলেন এখনও করেন। তিনি জানেন উপার্জ্জনের কিছু অংশ ব্যয় করিলে যে সুনাম হয় তাহাতে তাহা পোষাইয়া যায়—কিছু লাভও হয়। ব্যবসায় করিতে টাকা যেমন প্রয়োজন, সুনামও তেমনি প্রয়োজন—দুই-ই মূলধন। তাঁহার দান অনেক। হরিসভার চাঁদা হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বড়দিনে ভেট পাঠান, সমস্তেতেই তিনি আছেন। তবে সমস্তই তিনি হিসাব করিয়া থাকেন। হরিসভায় যে চাঁদা দিলে চলে, ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যাপারে তাহার অনেক বেশী দেওয়া দরকার। এই উপায়ে তিনি রায় বাহাদুর খেতাব পাইলেন ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হইলেন।

চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইবার পর, মিউনিসিপালিটির সভ্যগণ সাড়ম্বরে তাঁহাকে অভিনন্দন দিলেন আর সেই উপলক্ষে তাঁহার

এক প্রকাণ্ড তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া উপহার দিলেন। শোনা যায় অভিনন্দনের সমস্ত ব্যয় এবং তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইবার মূল্য রায় বাহাদুর নিজেই বহন করিয়াছিলেন প্রকাশ্যে নহে অপ্রকাশ্যে। আমাদের অবশ্য ও সমস্ত ছোট কথায় কান না দেওয়াই ভাল।

ছিত্রখানি এক প্রসিদ্ধ বিলাতি চিত্রকরের আঁকা। সাহেব ইহার জন্য অনেক টাকা লইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ চিত্রকর, সাহেব চিত্রকর, অনেক টাকা খরচ পড়িয়াছে, কাজেই ছবি যে চমৎকার হইয়াছে তাহা বলিতেই হইবে। কিন্তু বলিলে কি হয় অনেকেই মনে মনে জানেন, এবং হরিহর গৃহিণী বলিয়া থাকেন উহা হরিহর মুখোপাধ্যায় সশরীরে যাহা, ছবিতে তাহা ফোটে নাই। তবে হাঁ, রায় বাহাদুরের জাব্বা-জোব্বা মায় রায় বাহাদুরের সনদখানা ধরিবার কায়দা পর্য্যন্ত হুবহু ঠিক হইয়াছে।

রায় বাহাদুরের গৃহিণী ছবিখানাকে বরদাস্ত করিতে পারেন না, তা' সত্য। কিন্তু রায় বাহাদুরই বা কি করিবেন? যে ছবির অতবড় একটা গৌরবময় ইতিহাস, তাহাকে হলঘরে না রাখিয়া কোথায়ই বা রাখিবেন। ছবিখানা ঘরে আসিবার পূর্ব্বে যাহা খরচ হইয়াছে তাহা ত' হইয়াছে। ঘরে আসিলে আবার তাহাকে ভাল ফ্রেমে বাঁধানও হইয়াছে। এত করিয়া যে প্রতিকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে রায় বাহাদুর নিজেও যে তাহা খুব পছন্দ করেন তাহা নহে। কিন্তু অবস্থা গতিকে ও ভদ্রতার খাতিরে ইহাকে পছন্দ ও প্রশংসা দুই-ই তাঁহার করিতে হয়।

ছবির জন্য রায় বাহাদুরের যাহা খরচ হইয়াছে তাহা তাঁহার কাছে খুব একটা ধর্ত্তব্যের বিষয় নয়। কেননা ভবিষ্যতে কাজ দিবে ভাবিয়া এমন অনেক খরচই তিনি করিয়া থাকেন। ছবির ব্যাপারে যাহা হইয়াছে তাহা ত' হইয়াছে এখন ইহাকে বিদায় করিবার উপায় কি। তিনি ইহা দান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কাহাকে দিবেন আর কি উপলক্ষ্য করিয়াই বা দিবেন।

রায় বাহাদুর অনেক ভাবিয়াছেন। শোভনভাবে ছবি বিদায় করিবার কোন পথ খুঁজিয়া পান নাই।

(২)

রায় বাহাদুর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট। বিনা বেতনে সম্মান মাত্র পাইয়া তাঁহাকে হাকিমের কাজ করিতে হয়। সেদিন তাঁহারই কোর্টে এক চোরের বিচার হইতেছিল। যে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর এই দুঃসাহসী ও কৌশলী চোর ধরিয়াছেন তিনি মোকর্দ্দমার আরম্ভে যে বর্ণনা দিলেন তাহার মোট কথা হইতেছে—সহরে কিছুদিন ধরিয়া অত্যন্ত চোরের উপদ্রব হইয়াছে। চোরদের একটা দল আছে, তাহারা পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া এই সমস্ত চুরি করিয়া বেড়াইতেছে। ধৃত চোরটি দলের সর্দ্দার। ইহাকে জেলে পুরিয়া দিলে সহরের চুরি বন্ধ হইয়া যাইবে। চোর কোথায় কাহার কি চুরি করিয়াছে জানা গেল না। সে এমনিই পাকা চোর যে সে সম্বন্ধে তাহাকে দিয়া কিছুই স্বীকার করান গেল না। ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব নিজে তাহাকে ধরিয়াছেন।

হাকিম হরিহর চোরকে তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিতেই সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—

"হুজুর ধর্ম্মাবতার, মুই পাড়াগেঁয়ো নোক, সহরে এসনু কাজের তেষ্টায়। মুনিহারি দোকানের কাছপানে দেঁড়িয়ে ছিনু, এনাবা তুই চোর বলে ফাটকে পুরে দিল।"

চোরের কথায় কোর্টের উকিল মোক্তাবদের মুখে চাপাহাসি ফুটিল, ইন্‌স্‌পেক্টর কটমট্ করিয়া তাকাইলেন, হাকিম গম্ভীর হইলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টরের বক্তৃতার পর, একটি কনেষ্টবল ও এক খোট্টা পানওয়ালা, তাঁহার উক্তির সমর্থন করিল। সাধারণতঃ এইটুকু সাক্ষ্যপ্রমাণের জোরেই পুলিশের-ধরা যে-কোন লোকের শাস্তি হইয়া থাকে। আমাদের চোরের ভাগ্য ভাল, রায় বাহাদুর হরিহর মুখোপাধ্যায় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাহার কেস পড়িয়াছিল। রায় বাহাদুরের ন্যায় বিচারক এবং দয়ালু হইবার সখ ব্যতীত আরও এক গূঢ় মতলব ছিল। ফলে, মোকর্দ্দমা তিনি ডিসমিস করিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে একটি মন্তব্য এবং চোরের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

বলিলেন পুলিশ কর্ম্মচারীর সন্দেহ হইলেই একটা লোককে পাকড়াও করিয়া জেল দেওয়া যায় না, ইন্‌স্‌পেক্টরের ইহা জানা উচিত। আর চোরকে বলিলেন সে যেন পরে তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করে, তাহাকে তিনি কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন। লোকটিকে অভাবগ্রস্ত বলিয়া মনে হইতেছে।

বিচার শেষ হইল, আদালত ভাঙ্গিয়া গেল, উকিল, মোক্তার, হাকিম সন্ধ্যায় যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকালে রায় বাহাদুরের বাড়ীতে একটি লোক তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। না বলিয়া দিলে কেহ সহসা চিনিতে পারিবে না যে এই লোকটি গতকালের অভিযুক্ত চোর। রায় বাহাদুর কিন্তু চিনিলেন, এবং খুশীও হইলেন এই ভাবিয়া যে লোকটিকে যেরূপ চতুর মনে হইতেছে তাহাতে ইহাকে দিয়া যে কাজ করাইবেন ভাবিয়াছেন তাহা হইবে।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নামটা কি যেন বললে কাল ?"

চোর—"আজ্ঞে চোরের আর নাম কি ? আজ এক নাম, কাল আর এক নাম।"

রায় বাহাদুর—"তাহলে সত্যিই তুমি চোর, গরীব পাড়াগাঁয়ে লোক টোক ওসব মিথ্যা কথা ?"

(চোর দাঁত বাহির করিয়া বিনয়ে একেবারে গলিয়া পড়িয়া) "হুজুর ধরেছেন ঠিক, হাকিম ত' বটে ? আপনার কাছে লুকোবো না।"

রায় বাহাদুর কাজের কথা আরম্ভ করিলেন—"তা' চুরি ব্যবসায়ে কি বেশ সুবিধা হয় ?"

"মন্দ কি ? তবে আপনার মত হাকিম না হলে কালই আবার অন্ততঃ ছ'মাসের মত আটক পড়ে যেতে হত—এই যা' ।"

রায় বাহাদুর মাথা চুলকাইলেন, ভাবিলেন, কাশিলেন শেষে কাল চোরের বিচারের সময় হইতে যে অপরূপ প্ল্যানটি তাঁহার খেলিতেছিল তাহা বলিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন "চুরিই যখন কর, আমার একটা জিনিষ ইচ্ছে করেই চুরি করতে দেবো—করবে ?"

চোর কথাটা বুঝিল না। না বুঝিবারই কথা। বিশ বৎসরের উপর যে চুরি করিয়া আসিতেছে, ধরা পড়িয়াছে না-ও পড়িয়াছে। এ পর্য্যন্ত স্ব-ইচ্ছায় সুস্থ মস্তিষ্কে বন্দোবস্ত করিয়া নিজের জিনিষ কেহ চুরি করায় এ অভিজ্ঞতা তাহার নাই। যথেষ্ট বুদ্ধিমান হইয়াও সে রায় বাহাদুরের প্রস্তাবটি বুঝিতে পারিল না। রায় বাহাদুর তখন দৃষ্টান্ত সহযোগে তাহার বক্তব্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন। বলিলেন—

"হলঘরে একখানা মস্ত ছবি আছে—ছবিখানা আমারই। আমি চাই ওখানা কেউ ওখান থেকে চুরি করে নিয়ে যায়।"

"চুরি করে নেবে ?"

"হাঁ ওটাকে আমি ওখান থেকে বিদেয় করতে চাই। আর সেই সঙ্গে এও চাই, যে সকলে মনে করবে ছবিখানা কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"আপনিই কেন একদিন দু'পুর রাতে চুপি চুপি এসে ওখানা খুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন না। বলবেন চুরি হয়ে গিয়েছে।"

"সে অনেক অসুবিধের ব্যাপার। রাত্রে উঠে খুট্ খাট্ করে ছবি খোলা, তারপর আগুন জ্বালান, পোড়ান—অত সমস্ত কি গোপন করা যায়? কেউ না কেউ দেখে ফেল্‌বে।"

"তা' হুজুর, একাজের জন্য কি পাওয়া যাবে?"

"কেন? ছবি খানাইত তুমি পাচ্ছ, ওর দামও ত কম নয়। প্রায় হাজার টাকা খরচ হ'য়েছে ঐ ছবির জন্য।"

"আপনার ছবি, আপনার কাছে দাম। আমি ত' আর বিক্রী করে কানা কড়িও পাচ্ছি নে। বরং বিক্রী করতে গেলে ধরাই পড়ে যাবো।"

রায় বাহাদুর চোরের যুক্তির সারবত্তা বুঝিলেন। আরও কিছু অর্থদণ্ড না করাইয়া ও ছবি বিদায় হইবে না। রায় বাহাদুরকে বিব্রত দেখিয়া চোর কি ভাবিল, বলিল—

"বেশ, আমি রাজি; আপনিও ত' আমার উপকার করেছেন, আমিও না হয় আপনার কিছু উপকার করলাম। জানেনই ত' বিনা লাভে কেউ কিছু করে না।"

"তা হলে কবে চুরি কর্‌বে? আজ রাতে?"

"আজ হবেনা, অন্য কাজ আছে।"

"কাল?—"

"কালও হবে না।"

"পরশু?"

স্থির হইল পরশু রাতে বারোটা হইতে একটার মধ্যে রায় বাহাদুরের বিখ্যাত প্রতিকৃতি তাঁহার বাড়ীর হলঘর হইতে চুরি

যাইবে। ইহার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা রায় বাহাদুর করিয়া রাখিবেন।

চোর নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। আজ হইতে তৃতীয় রাত্রে যে অপূর্ব্ব অভিযান হইবে তাহা কল্পনানেত্রে চাক্ষুষ করিয়া, রায় বাহাদুরের মাথা হইতে একটি দুশ্চিন্তা নামিয়া গেল। ঐ দুঃসহ ছবি বিদায় করিবার জন্য তিনি অনেকবার অনেক মতলব আঁটিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন ফল হয় নাই। একজিবিশনে ছবি পাঠাইয়াছেন এই ভাবিয়া যে একজিবিশনের বারোয়ারি ব্যাপারে ছবি যদি খোয়া না-ও যায়, অন্ততঃ নষ্ট হইয়া যাইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় ছবি যে, সেস্থান হইতে অক্ষত ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাই নহে, সাহেবের আঁকা রায় বাহাদুরের ছবি পুরস্কারও পাইয়াছে।

কয়েকদিন আগেই ভাবিয়াছিলেন হলঘরে তোড়জোড় করিয়া ছোটখাটো একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া ছবিখানা পোড়াইয়া দিবেন। কিন্তু তাহাতে বিপদ আছে। ছোট অগ্নিকাণ্ড বড় অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। ইহার পরই তিনি চোরকে পাইয়া প্ল্যান বদলাইয়া ফেলিলেন।

(৩)

চুরি করাইবার যাবতীয় ব্যবস্থা যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে রায় বাহাদুরকে অনেক কিছু করিতে হইল। চোরেরা নিজের প্রয়োজনে গৃহস্থের অসতর্কতার সুযোগ লইয়া নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া চুরি করে, সেখানে গৃহস্থের কিছু ভাবিবার থাকে না—যাহা

কিছু ভাবনা চোরের। এখানে যাহা কিছু ভাবনা গৃহস্থ রায় বাহাদুরের, চোর ধরা পড়িলে চোরের বিপদ অপেক্ষা গৃহস্থের যত বিপদ।

রায় বাহাদুরের ইচ্ছা অনুসারে রাতের খাওয়া কিছু সকাল সকাল সমাধা হইল। তাঁহার নাকি কতকগুলি জরুরী লেখালেখির কাজ রাত্রেই শেষ করিয়া রাখিতে হইবে। এ কারণ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নীচের তলায় আফিস ঘরে থাকিতে হইবে। চাকরবাকর কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই। টেবিলে এক গ্লাস জল রাখিয়া গেলেই চলিবে। কন্‌ট্রাক্টর-হাকিম রায় বাহাদুর সমস্তই এমন নিখুঁতভাবে ব্যবস্থা করিলেন যে কেহই সন্দেহ করিতে পারিল না তাঁহারই সুদক্ষ প্রযোজনায় মধ্য রজনীতে কি এক দুঃসাহসিক চুরি সংঘটিত হইবে।

তিনি স্বয়ং নীচের ঘরে সশরীরে বিদ্যমান থাকিতে কি করিয়া হলঘর হইতে তাঁহার ছবি চুরি হইয়া গেল ইহার একটা জবাবও রায় বাহাদুর ঠিক করিয়া রাখিয়া দিলেন। বলিবেন কাগজপত্র লইয়া তিনি এমনই ডুবিয়াছিলেন যে পাশের ঘরে কি হইতেছে না হইতেছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

বারোটার পর হইতেই তিনি বারবার ঘড়ি দেখিতে লাগিলেন, কখন চোর আসে, কখন চোর আসে। সদর দরজা বন্ধ না করিয়া ভেজান ছিল, চোর পাছে তাহা না বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া যায় আশঙ্কায় দরজা তিনি একটু ফাঁক করিয়া রাখিলেন। কোন অতি প্রভুভক্ত ভৃত্য, তিনি চলিয়া যাইতে বলিলেও, না যাইয়া কোথাও

বসিয়া আছে কি-না দেখিবার জন্য চারিদিক ঘুরিয়া আসিলেন। দেখিলেন সমস্তই ঠিক আছে এখন চোর আসিলেই হয়। সে সদর দরজা দিয়া আসিয়া হলঘর হইতে ছবি চুরি করিয়া খাবার-ঘরের জানালা দিয়া বাহির হইয়া যাইবে—কাজেই খাবার ঘরের জানালা খুলিয়া রাখিলেন। বলা চলিবে যে চাকরেরা ভুলক্রমে খাবার ঘরের জানালা বন্ধ করে নাই। চোর জানালা দিয়া আসিয়া চুরি করিয়া সেই জানালা দিয়া পালাইয়াছে বলিলে মন্দ শুনাইবে না।

রায় বাহাদুর অনেকক্ষণ ধরিয়া উদ্বেগ বহন করিলেন। এমন উদ্বেগ আর কোনদিন তিনি ভোগ করেন নাই। অবশেষে বারোটা বাজিয়া পনেরো মিনিটের সময় সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আধখোলা সদর দরজা আরও একটু খুলিয়া অতি সন্তর্পণে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ঘরে প্রবেশ করিল। রায় বাহাদুর দেখিয়াও দেখিলেন না। পরে আরও একটি লোক ভিতরে আসিল। রায় বাহাদুর ভাবিলেন চোরের বুদ্ধি আছে। একা একা অতবড় ছবি খোলাখুলি করা সহজ হইবে না বলিয়া একজন সঙ্গী আনিয়াছে দেখিতেছি। ভালই করিয়াছে।

রায় বাহাদুর কাগজপত্র ছড়াইয়া কাজের মধ্যে ডুবিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাশের ঘরে কি হইল না হইল, কোথায় ক্যাঁচ্ করিল বা ঠুক্ করিল বা ঠন্ করিল শুনিয়াও শুনিলেন না।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল সমস্ত বাড়ীতে কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই। সমস্ত সহর নিস্তব্ধ—কানে আসিল

শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিঁ—ঝিঁ আর দূরে এক বাড়ীর কুকুরের ভেউ—ভেউ—ভ্যাক্—

রায় বাহাদুরের কৌতূহল হইল একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যান সত্যসত্যই তাহার তৈলচিত্র আর যথাস্থানে নাই। তিনি হাকিম সে কৌতূহল দমন করিলেন। সকালে চাকর-বাকরেরাই প্রথম আবিষ্কার করিবে যে বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে—ইহাই স্বাভাবিক। তিনি সদর দরজা বন্ধ করিয়া উপরে যাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

রাত্রে তাঁহার ঘুম হইয়াছিল কি-না জানি না। পরদিন সকালেই বাড়ীময় হুলুস্থূল পড়িয়া গেল—রায় বাহাদুরের বাড়ীতে চুরি হইয়াছে। রায় বাহাদুর ব্যস্তসমস্তের ভাণ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

শুনিলেন খাবার ঘরের আলমারি হইতে যাবতীয় দামী দামী বাসনপত্র চুরি গিয়াছে।

ছবি যথাস্থানেই রহিয়াছে।

বৃদ্ধবাদী ও সিদ্ধসেন

শ্রীসুকুমার সেন, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

যে সময়ের কথা বল্‌ছি তখন বাংলাদেশে জৈন ধর্ম্মের বেশ প্রসার ছিল। বড় বড় জৈন সাধুরা তখন এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতেন জৈন বিহার ও আখড়া পরিদর্শন করে এবং জৈন ধর্ম্ম প্রচার করে। স্কন্দিল-আচার্য্য নামে এক জৈন মহান্ত ভ্রমণক্রমে একদা গৌড়দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁর কাছে বহুলোক আস্‌ত উপদেশ শুন্‌তে। একদিন মুকুন্দ নামে এক বামুনের ছেলে, একটু বয়স হয়েছে, নিবাস কোশল গ্রামে, স্কন্দিল-আচার্য্যের উপদেশ শুন্‌তে এসেছিল। সেদিন আচার্য্য যা উপদেশ দিয়েছিলেন তার সার মর্ম্ম হচ্ছে যে সংসারে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাক্‌তে হয়—ভোগে রোগের ভয়, সুখে সুখহানির ভয়, ধনে নাশের ভয়, চাকুরিতে প্রভুর ভয়, গুণে খলের ভয়, স্নেহে বৈর ভয়, শরীরে যমের ভয়—কেবল বৈরাগ্য আশ্রয় করলেই নির্ভয় হওয়া যায়। মুকুন্দের মনে লাগল এ কথা। সে সংসার ত্যাগ করে স্কন্দিল-আচার্য্যের শিষ্য হল এবং গুরুর সঙ্গে ভৃগুপুর চলে গেল। সেখানে গুরুর কাছে থেকে সে পড়াশোনায় মন দিলে। বাংলাদেশের ভালোমানুষ ছেলে, সে জানে "অভ্যাসঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী," চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করা তাদের চিরদিনের অভ্যাস। রাত্রিতেও সে তারস্বরে অধ্যয়ন চালাতে লাগল বুদ্ধির অভাবটুকু পুরিয়ে নেবার জন্যে। তাতে

বিহারবাসী সাধুদের ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। সাধুদের বিরক্তি-ভাব বুঝতে পেরে আচার্য্য মুকুন্দকে ডেকে বললেন, 'বৎস, মনে মনে পড়, রাত্রিতে চীৎকার ক'রলে হিংস্রজীব জেগে উঠে তাতে অনর্থ উৎপত্তি হয়।' রাত্রিতে চেঁচিয়ে পড়া বন্ধ হওয়ায় মুকুন্দ তা পুষিয়ে নিতে লাগল দিনের বেলায়। তার দিবা-পঠনে, গৃহস্থ মেয়ে-পুরুষেরা যারা বিহারে পূজা দিতে ও সাধুদের উপদেশ শুনতে আসত তাদের কর্ণজ্বর হতে লাগল। লোকে বলাবলি করতে লাগল, 'এ বুড়ো পড়ুয়া পড়ার চোটে মুগুরে ফুল ফোটাবে নাকি ("কিময়মিদংবয়াঃ পঠিত্বা মুশলং পুষ্পাপয়িষ্যতি")'? এই কানাকানি শুনে মুকুন্দ ক্ষুব্ধ হ'ল। সে মন্দিরে ঢুকে সরস্বতীর ধ্যান জুড়ল একটানা একুশদিন ধরে উপবাস করে। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মী দেবী সাক্ষাৎ হয়ে বর দিলেন, 'সর্ব বিদ্যায় সিদ্ধ হও ("সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধো ভব")'। মুকুন্দ তৎক্ষণাৎ সর্ববিদ্যাসিদ্ধ কবীন্দ্র হয়ে গুরুর সভায় এসে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে অক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'আমাকে কেহ উপহাস করে বলেছিল এ বেটা কি মুশলে ফুল ফোটাবে। এখন আপনারা দেখুন মুশলকে পুষ্পিত করতে পারি কি না।' এই বলে একটি মুশল এনে চৌমাথায় পুঁতে দিয়ে মুকুন্দ মন্ত্রশক্তিবলে সেটিকে পুষ্পিত করলে তারপর ঘাড়ে করে বেড়াতে লাগল পণ্ডিতদের তর্কে আহ্বান করে। দেশের বড় বড় পণ্ডিত সকলেই তার কাছে পরাজয় মানল। মুকুন্দ খ্যাত হলেন "বৃদ্ধবাদী" নামে। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্কন্দিল-আচার্য্য বৃদ্ধবাদী মুকুন্দকে নিজের গদি দিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধবাদী ভৃগুপুরে জৈন বিহারের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এদিকে অবন্তীতে কাত্যায়ন-গোত্রীয় দেবর্ষি নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন। তাঁর পত্নীর নাম দেবসিকা। তাঁদের সর্বজনমান্য পুত্র সিদ্ধসেন অল্পবয়সেই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত, তার বিদ্যার পার পাওয়া যায় না। প্রজ্ঞাবলে সে জগৎকে তৃণবৎ গণনা করে। তার প্রতিজ্ঞা, যিনি আমাকে তর্কে পরাস্ত করবেন তাঁরই আমি শিষ্য হ'ব ("যেন বাদে জীয়ে তস্যাহং শিষ্যঃ স্যামিতি প্রতিজ্ঞা তস্য")। একদা বৃদ্ধবাদীর বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি সিদ্ধসেনের কর্ণগোচর হল। অমনি সে চল্‌ল ভৃগুপুরে বৃদ্ধবাদীর সঙ্গে বিচার-তর্ক করতে। সেই সময়ে সাধু বৃদ্ধবাদীও কার্য্যসূত্রে অন্যত্র চলেছেন। দু'জনে সাক্ষাৎ হল পথে। পরস্পরের পরিচয় হলে সিদ্ধসেন বল্‌লে, 'আসুন আমার সঙ্গে বিদ্যা বিচারে।' সাধু বল্‌লেন, 'বেশ, কিন্তু "সভ্য" হবে কে? মধ্যস্থ সভ্য না থাক্‌লে বিচারে জয় পরাজয় নির্দেশ ক'রবে কে ("সভ্যান্ বিনা বাদে জিতাজিতে কো বদেৎ")?' সিদ্ধসেন বল্‌লে, 'এই রাখালেরা গোরু চরাচ্ছে, এরাই সভ্য হোক।' বৃদ্ধবাদী বল্‌লেন, 'বেশ, তুমি বক্তৃতা শুরু কর।' পাণ্ডিত্য-অন্ধ সিদ্ধসেন স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক বলে চল্‌ল ("চিরং সংস্কৃতেন জল্পমনল্পমকরোৎ")। অনেকক্ষণ পরে থাম্‌লে রাখালেরা বল্‌লে, 'এ লোকটা কিছুই জানে না, কেবল খটমট যা তা বলে আমাদের কানে তালা ধরিয়ে দিলে ("কিমপ্যয়ং ন বেত্তি কেবলমুচ্চৈঃ পুৎকারং পুৎকারং কর্ণৌ নঃ পীড়য়তি"); বৃদ্ধ, এইবার তুমি কিছু বল।'

তখন স্থান-কাল-পাত্রজ্ঞ বৃদ্ধবাদী ভালো করে কাছা বেঁধে নিয়ে রাখালদের বোধগম্য ভাষায় ও ভাবে ছড়া কাট্‌তে লাগ্‌লেন,

নবি মারিয়ই নবি চোরিয়ই
পরদারহ গমণু নিবারিয়ই।
থোবাথোউং দাবিয়ই
সগ্‌গি টুকুটুকু জাইয়ই॥

অর্থাৎ—প্রাণহানি করে না, চুরিও করে না, পরদারগমন থেকে নিবৃত্ত হয়, অল্পস্বল্প দান করে,—টুক্ টুক্ করে স্বর্গে চলে যায়।

বৃদ্ধবাদীর কবিতা শুনে রাখালেরা খুশি হয়ে বল্‌লে, 'বুড়ো পণ্ডিত সব জানেন! আহা কি মধুর এঁর বক্তৃতা; ছোক্‌রা বড় বাজে বক্‌লে ("বৃদ্ধবাদী সর্ব্বজ্ঞঃ। অহো কীদৃক্ শ্রুতিসুখমুপযোগি পঠতি। সিদ্ধসেনস্তু অসারপাঠকঃ")'।

সিদ্ধসেন পরাজয় স্বীকার করে বল্‌লে, 'প্রভু, আমাকে সন্ন্যাস দিন। আমি আপনার শিষ্য হলুম সভ্যদের বিধানে পরাজিত হয়ে।' বৃদ্ধবাদী বল্‌লেন, 'ভৃগুপুরে রাজসভায় আমাদের বিচার হোক, রাখালদের সভায় একি আর বিদ্যাবিচার।' সিদ্ধসেন বল্‌লেন, 'আমি কালজ্ঞ নই, আপনি কালজ্ঞ। যে কালজ্ঞ সেই সর্ব্বজ্ঞ। আপনারই জয় হয়েছে।' অগত্যা বৃদ্ধবাদী সেইখানেই সিদ্ধসেনকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে সিদ্ধসেনের নাম ছিল কুমুদচন্দ্র, দীক্ষার পর নাম হল সিদ্ধসেন-দিবাকর।

কিছুকাল পরে সিদ্ধসেন অবন্তীতে ফিরে গেলেন। রাজা তাঁকে খুব খাতির করলেন এবং অনেক টাকা কড়ি দিলেন। সে

সব সিদ্ধসেন নিলেন না, রাজাও ফিরে নিতে চাইলেন না। আচার্য্য সিদ্ধসেনের মত নিয়ে সে টাকা মন্দির সংস্কারে খরচ করা হল।

একদা সিদ্ধসেন চিত্রকূট অঞ্চলে পর্য্যটন করছিলেন। সেখানে একটি পুরানো চৈত্যে একটি বড় স্তম্ভ ছিল। সেটিকে দেখিয়ে একজন সিদ্ধসেনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ স্তম্ভটি কেন? কিসের তৈরী এটি ("কোঽয়ং স্তম্ভো মহান্ কিংময়ঃ")?' সিদ্ধসেন উত্তর করলেন, 'এর মধ্যে পূর্বাচার্য্যেরা গোপনীয় বিদ্যার পুস্তক লুকিয়ে রেখে গেছেন। স্তম্ভটি গুপ্ত ঔষধদ্রব্য নির্মিত, বজ্রের মত কঠিন, হাওয়া জল ইত্যাদি ঢুকতে পারে না।' তাদের কথায় সিদ্ধসেন স্তম্ভ উদ্ঘাটন করতে রাজি হলেন। তিনি সেই স্তম্ভের গন্ধ শুঁকে স্তম্ভ খোলবার ঔষধ তৈরী করে স্তম্ভে মাখিয়ে দিলেন। পরের দিন সকালে দেখা গেল স্তম্ভটি খুলে গিয়ে পদ্মফুলের আকার ধারণ করেছে আর মাঝখানে কতকগুলি পুঁথি রয়েছে। একটি পুঁথি খোলা হলে প্রথম পাতাতেই দু'টি বিদ্যার সন্ধান পাওয়া গেল। একটি হচ্ছে সর্ষপ-বিদ্যা অপরটি হেম-বিদ্যা। সর্ষপ-বিদ্যার প্রভাবে মন্ত্র পড়ে জলাশয়ে যতগুলি সর্ষে ফেলে দেওয়া হবে ততগুলি ঘোড়সওয়ার বিয়াল্লিশ রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুকুর থেকে উঠে আসবে। তারা শত্রুদমন করে আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে। হেম-বিদ্যার বলে যে-কোন ধাতু থেকে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা নিষ্পন্ন হবে। সিদ্ধসেন এই দু'টি বিদ্যা ভালো করে অধিগত করলেন। তারপর মন্ত্র পড়ে সেই স্তম্ভকে পূর্ববৎ খাড়া করে দিলেন, পুঁথিগুলি তার মধ্যে বন্ধ হয়ে রইল। তারপর

আকাশবাণী হল, 'রহস্য বিদ্যার অযোগ্য তোমরা, চপলতা করো না, স্তম্ভ খোলবার চেষ্টা করলে মারা পড়বে।' সিদ্ধসেন দু'টিমাত্র রহস্য-বিদ্যা পেলেন, আর পেলেন না।

চিত্রকূট থেকে সিদ্ধসেন গেলেন পূর্বদেশে কূর্মারপুরে। সেখানে রাজা দেবপালের সভায় তাঁর খুব প্রতিপত্তি হল। সিদ্ধসেন সেখানেই রয়ে গেলেন রাজসভা জমিয়ে। একদিন রাজা সভায় এসে কাতর হয়ে বললেন, 'প্রভু আমরা পাপী, আপনার এমন মধুর সঙ্গসুখের যোগ্য নই, তাই সঙ্কটে পড়েছি।' আচার্য্য বললেন, 'আপনার কিসের সঙ্কট?' রাজা বললেন, 'সীমান্তের রাজারা একজোট হয়ে আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে।' সিদ্ধসেন সান্ত্বনা দিলেন, 'মহারাজ, বিচলিত হবেন না। আমি আপনার সখা সুতরাং রাজ্যশ্রী আপনারই অধিগত আছে এবং থাকবেও।' রাজা নিশ্চিন্ত হলেন। সেই দুই রহস্য-বিদ্যার বলে আচার্য্য রাজার কোষ ও বল বৃদ্ধি করে দিলেন। শত্রুসৈন্য পরাজিত হল, তাদের সর্বস্ব রাজা কেড়ে নিলেন। উৎসববাদ্য বেজে উঠল। তারপর থেকে আচার্য্য সিদ্ধসেনই কার্য্যত রাজা হলেন। তাঁর চেলারা ধর্মাচরণে শিথিলপ্রযত্ন হল। ধামিক গৃহস্থেরাও নিয়মিত উপোসব্রত করা ছেড়ে দিলে।

শিষ্য সিদ্ধসেনের এই অপযশ লোকপরম্পরায় ভৃগুপুরে গুরু বৃদ্ধবাদীর কানে পৌঁছল। তিনি শিষ্যের উপর কৃপাপরবশ হয়ে বিষয়ভোগ হতে উদ্ধার করবার জন্যে একাকী চললেন পূর্বদেশে। কূর্মারপুরে পৌঁছে তিনি রাজসভার দ্বারে এসে

দাঁড়ালেন। দারোয়ান সিদ্ধসেনকে খবর দিলে, এক বুড়ো সাধু এসেছে। সিদ্ধসেন তাঁকে আনতে হুকুম দিলেন। সর্বাঙ্গ কাপড়-ঢাকা হয়ে বৃদ্ধবাদী সভায় এসে বসে বল্‌লেন, 'এই কবিতাটির মানে বুঝিয়ে দিতে হবে—

অণফুল্লিয় ফুল্ল ম তোড়হিঁ
মা মন-রোবা মোড়হিঁ।
মন-কুসুমেহিঁ অচ্চি নিরংজণু
হিংডহি কাঁই ষণেণ বণু ॥

অর্থাৎ—যে ফুল ফোটেনি তা ছিঁড়ো না, মনে রোয়া গাছ ভেঙো না; মন-কুসুমে নিরঞ্জনের পূজা হয়; কেন বনে বনে ঢুঁড়ছ।

কবিতার অর্থ সিদ্ধসেন করতে পারলেন না অনেক ভেবে-চিন্তেও। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ইনি কি তবে আমার গুরু বৃদ্ধবাদী? তিনি ছাড়া এমন কে আছে যার কথার মানে আমিও করতে পারি না। অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে সিদ্ধসেনের ঠাওর হল গুরু বলে। তখন তিনি পড়লেন গুরুর পায়ে লুটিয়ে, বললেন, 'পদ্যটির মানে বলে দিন।' গুরু মানে বুঝিয়ে দিলেন। সিদ্ধসেনের চৈতন্য হল। তিনি গুরুর শিক্ষা মাথায় ধরে রাজার কাছে বিদায় নিয়ে গুরুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন পথে।

সিদ্ধসেনকে ভৃগুপুর বিহারের আচার্য্য করে দিয়ে বৃদ্ধবাদী নির্বাণ লাভ করলেন। সিদ্ধসেন গুরুপীঠ আর ছাড়লেন না। তাঁর দেহান্ত হলে চিত্রকূট-বিহারে সিদ্ধসেনের শিষ্যসম্প্রদায়ের কাছে এই নিদারুণ সংবাদ পাঠানো দায় হল। কেউই যেতে

চায় না। অবশেষে এক বাগ্মী ভট্টকে রাজি করান গেল। ভট্ট কিন্তু চিত্রকূটে এসে সাধুসমাজে আর মুখ ফুটে শোকসংবাদ বলতে সাহস পান না। তিনি পুনঃপুন এই শ্লোকার্দ্ধ বলতে লাগলেন,

স্ফুরন্তু বাদিখদ্যোতাঃ সাম্প্রতং দক্ষিণাপথে।

অর্থাৎ—জোনাকির মত ক্ষীণদীপ্তি পণ্ডিতেরা এখন দক্ষিণাপথে স্ফূর্ত্তি করুক।

এর অর্থ কেউই বুঝতে পারেন না। অবশেষে সিদ্ধসেনের ভগিনীর খেয়াল হল। তিনি আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠলেন,

নূনমস্তং গতো বাদী সিদ্ধসেনো দিবাকরঃ॥

অর্থাৎ—নিশ্চয়ই পণ্ডিত-সূর্য্য সিদ্ধসেন এখন অস্ত গেছেন।

তখন ভট্ট সাহস করে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন॥

কবি ও বস্তুতান্ত্রিক

কবি—"আকাশে কি সুন্দর রংএর শোভা হয়েছে!"

বস্তুতান্ত্রিক—"ওর একটাও কিন্তু পাকা রং নয়।"

পিরামিডের অভ্যন্তরে

শ্রীহীরালাল মুখোটী

দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডারের রাজত্বকালে গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের তালিকা প্রস্তুত করেন এবং মিশরের পিরামিড তাহাতে শীর্ষস্থান লাভ করে। সপ্তাশ্চর্য্যের মধ্যে পরমাশ্চর্য্য একমাত্র পিরামিডগুলিই আজ পর্য্যন্ত কালের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া স্বকীয় মহিমায় বিরাজ করিতেছে।

এই পিরামিডগুলি কবে কাহার দ্বারা এবং কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নিয়া বহুকাল ধরিয়া বহুবিধ গবেষণা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এই মৌণ তপস্বীদল সমস্ত গবেষণাকে উপেক্ষা করিয়া রাখিয়াছে।

সম্রাট নেপোলিয়ান যখন মিশর দেশ আক্রমণ করেন তখন তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের সমগ্র দেশটি জরিপ করিবার আদেশ দেন। বিশেষজ্ঞ দল প্রধান পিরামিডকে মাধ্যান্দিন রেখায় (Meridian) স্থাপনা করিয়া নীল নদের বদ্বীপ অর্থাৎ সমগ্র নিম্ন মিশর জরিপ করিয়া মানচিত্রে অঙ্কন করেন কিন্তু তাঁহারা আশ্চর্য্যের সহিত লক্ষ্য করেন যে প্রধান পিরামিডটি সমগ্র বদ্বীপটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে এবং এই পিরামিড হইতে দুইটি কর্ণরেখা (Diagonal) টানিলে কর্ণদ্বয় সমগ্র নিম্ন মিশরকে আবৃত করে। অধিকন্তু মিশরের কেন্দ্রীয় মাধ্যান্দিন রেখার উপরেই প্রধান পিরামিডটি অবস্থিত, পরবর্ত্তী কালে ইহাও

প্রমাণিত হয় যে এই কাল্পনিক রেখাটিই পৃথিবীর প্রাকৃতিক মাধ্যান্দিন রেখা এবং সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগকে সম দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যরচিত এই কীর্ত্তি এবং ভৌগোলিক বিভাগের এই বিচিত্র মিলন সত্যসত্যই আকস্মিক কিনা বিচার্য্য!

ইহার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ মতবাদ প্রচলিত আছে। এই পিরামিডটি জরিপকার্য্যের জন্যই যে সৃষ্ট হইয়াছিল ইহা প্রমাণ করিতে জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান রেল ইঞ্জিনিয়ার বহুবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রোক্টর নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে এই বিচিত্র স্মৃতিস্তম্ভ জ্যোতির্ব্বিদ্যা অনুশীলনের জন্য গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি ও অবস্থিতি পর্য্যালোচনার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্য এক ঐতিহাসিক দল বলিলেন যে এই পিরামিডগুলি দুর্ভিক্ষের সময় মিশরবাসীদের রক্ষার্থে মজুত শস্যের গোলা হিসাবে ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিলেন ঐগুলি জলাধার হিসাবে ব্যবহৃত হইত। নিম্নলিখিত পিরামিডের অভ্যন্তরের বর্ণনা পাঠেই ইঁহাদের যাবতীয় যুক্তিতর্কের অসারতা প্রমাণিত হইবে।

মিশরবাসিগণ বলেন মিশরের চতুর্থ ফারাও "ফুকু" কর্তৃক তাঁহার মমি রক্ষার্থে এই বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ রচিত হইয়াছিল। ইহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে একজন রাজার মৃতদেহ যাহা কয়েক ফুট পাথরের নীচে সহজেই রক্ষিত হইতে পারিত তাহাই তাঁহার খেয়াল চরিতার্থের জন্য আফ্রিকার এই ভীষণ অনলবর্ষী রৌদ্রে, অমানুষিক পরিশ্রমে, বিপুল অর্থব্যয়ে তেইশ লক্ষ প্রস্তরের

(যাহার এক একটির ওজন অনূ্যন ৬০ হইতে ৭০ মণ) সাহায্যে ৮ কোটি ঘনফুটের এই বিশাল স্তূপ রচিত হইয়াছিল !

বহুদিন পর্য্যন্ত কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল যে এই পিরামিডগুলির অভ্যন্তরে মিশরের বহুকাল বিস্মৃত মৃত রাজাদের বহু ধনরত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে। সেই ধনরত্ন উদ্ধারের লোভে বহুকালব্যাপী বহু ব্যক্তি এই পিরামিডগুলির চতুস্পার্শ্বে অর্থগৃধ্নু লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে যাহাতে ভিতরে প্রবেশের কোন দ্বার আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু সকলকেই ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে অতিবাহিত হইল। পরে ৮২০ খ্রীঃ অব্দে বিশ্ববিশ্রুত আরব্য উপন্যাসের নায়ক হারুণ-অল-রসিদের পুত্র বোগদাদের খলিফা-অল-মামুন বহুবিশ্রুত অগাধ ধনরত্নরাশি উদ্ধার মানসে বহু ইঞ্জিনিয়ার স্থপতি, শিল্পী ও কর্ম্মী সমভিব্যাহারে গিজার উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন এবং পিরামিডের দ্বারপথ উদ্ঘাটনের আদেশ দিলেন। বিশেষজ্ঞ দলের নেতা বহুবিধ চেষ্টা ও পরীক্ষাকার্য্যের পর বলিলেন ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব। খলিফা অবিচলিত দৃঢ়তায় অসাধ্যসাধনে সঙ্কল্প জ্ঞাপন করায় পুনরায় নানাবিধ পরীক্ষামূলক কার্য্যের পরে পিরামিডের ভিতরে প্রবেশের জন্য উত্তরদিক হইতে খননকার্য্য আরম্ভ হইল। মামুনের দল মাসের পর মাস দিবারাত্র পাথর কাটিতে লাগিল কিন্তু যে কোন লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রই পাথর কাটিতে ভোঁতা হইয়া যাইতে লাগিল। লৌহ কর্ম্মকারগণ অনবরত যন্ত্রে ধার দিয়াও

বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। তখন বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তিত গর্ত্তে অগ্নিপ্রদান করিয়া উত্তপ্ত প্রস্তরে ভিনিগার ঢালিয়া ফাটলের সৃষ্টি করিল। পুনরায় লৌহযন্ত্রে ফাটলমুখে গর্ত্ত করিতে লাগিল। এইভাবে সুড়ঙ্গ করিয়া তাহারা পিরামিডের ১০০ ফুটেরও অধিক ভিতরে প্রবেশ করিল কিন্তু কোন দ্বার বা কক্ষের সন্ধান পাইল না। এদিকে খলিফা এই খননকার্য্যে তাঁহার রাজকোষ প্রায় শূন্য করিয়া ফেলিলেন। খননকারী দল এই অমানুষিক ব্যর্থ পরিশ্রমে উত্যক্ত হইয়া বিদ্রোহ করিবার উপক্রম করিল। খলিফাও নিরুপায় হইয়া অসাধ্যসাধনে বিরত হইবেন স্থির করিলেন। ঠিক এমন সময় এক ঘটনায় অবস্থার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। গুপ্তধন উদ্ধারকারী দল যেখানে পৌঁছিয়াছেন সেখানে দাঁড়াইয়া ভিতরের একটি গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। ইহাতে তাহারা পুনরায় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এই ভাবিয়া যে নিশ্চয়ই অভ্যন্তরভাগ শূন্য নতুবা এরূপ শব্দ হওয়া অসম্ভব। পুনরায় তাহারা পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে আরম্ভ করিল এবং অল্পকাল মধ্যেই একটি সুড়ঙ্গ পথে উপস্থিত হইল। এতদিনে শ্রেষ্ঠ পিরামিড উন্মুক্ত হইল।

অল্পায়াসেই এখন তাহারা সুড়ঙ্গ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং পিরামিডের গুপ্তদ্বারের সন্ধান পাইল। এই দ্বারটি ভিত্তি হইতে দশ ফুট উচ্চে অবস্থিত একটি প্রচণ্ড গ্রেনাইট পাথরে তৈরী এবং এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত যে বহির্দ্দেশ হইতে কোন কালেই আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বহু সহস্র বৎসর

অব্যবহারে এই পাথরটি একেবারে সাঁটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। অনেক চেষ্টায় তাহারা পাথরটি খুলিয়া ফেলিল। তৎপর তাহারা সুড়ঙ্গ পথ বাহিয়া পিরামিডের ভিতরের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখিল তাহাদেব পরিশ্রমের তখনো শেষ হয় নাই। সম্মুখেই একটি অতীব কঠিন কালো বর্ণের গ্রেনাইট প্রস্তরে সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ রহিয়াছে। বোধ হয় সমগ্র মিশর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করিয়া পিরামিড নির্ম্মাতাগণ এই জাতীয় প্রস্তরটি সংগ্রহ করিয়াছিল। এই প্রস্তরটিকে ভেদ করিবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। ভাগ্যক্রমে ইহার পার্শ্বেই চূণ জাতীয় একটি প্রস্তর ছিল। তাহাকে কাটিয়া কয়েক ফুট অগ্রসর হইতেই দেখা গেল পূর্ব্বোক্ত পাথরটি বহু টন ওজনের এক কিলকের ন্যায় দুইটি সুড়ঙ্গের সংযোগ মুখে প্রবেশ করাইয়া বন্ধ করা হইয়াছে। এই দুইটি সুড়ঙ্গের পথের প্রথমটি হেলান গতিতে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে অপরটি ২৬ ডিগ্রি কোণ করিয়া উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। এই সুড়ঙ্গটি উচ্চতায় ৪ ফুট এবং প্রস্থে ৩ ফুট মাত্র। কিছুদূর এই সরু পথ বাহিয়া উর্দ্ধদিকে উঠিবার পর মামুনের অনুচরগণ একটি ত্রিপথের সংযোগস্থলে উপনীত হইল। এই সংযোগস্থল হইতে একটি প্রশস্ত গলিপথ (উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট) হেলান গতিতে উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে, অপরটি সমান্তরাল গতিতে কেন্দ্রাভিমুখে গিয়াছে এবং তৃতীয়টি অপ্রশস্ত কূপের ন্যায় নিম্নগামী হইয়াছে। অনুসন্ধানকারী দল সমান্তরাল পথ বাহিয়া একটি প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল (পরবর্ত্তী যুগে এই কক্ষের নামকরণ

হইয়াছে রাণীকক্ষ) কিন্তু হায় তাহাদের আশা ফলবতী হইল না। এই প্রকোষ্ঠে অথবা তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র কক্ষ একেবারে শূন্য। তখন তাহারা পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া ঊর্দ্ধগ প্রশস্ত গলিপথ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। এই গলিপথের মেজে নিৰ্ম্মল এবং ছাত সপ্তস্তর প্রস্তরে অত্যাশ্চর্য্যরূপে নিৰ্ম্মিত। গুপ্তধন সন্ধানকারী দল একটানা ১৫০ ফুট এই গলিপথ বাহিয়া উপরে উঠিয়া ৩ ফুট উচ্চ একটি ধাপে বাধাপ্রাপ্ত হইল। এই ধাপটি অতিক্রম করিতেই তাহারা সম্মুখে একটি সমান্তরাল রাস্তার শেষ প্রান্তে একটি সম চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইল (পরবর্ত্তীকালে এই কক্ষটির নামাকরণ হইয়াছে রাজকক্ষ) এই কক্ষে একমাত্র আচ্ছাদন বিহীন প্রস্তরের একটি শবাধার ব্যতীত কিছুই মিলিল না। শবাধারটি উত্তর-দক্ষিণে শায়িত এবং ধূলি আবর্জ্জনায় পূর্ণ। গুপ্তধন সন্ধানীরা হতাশায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া প্রকোষ্ঠের যথা তথা খনন করিতে লাগিল, কিন্তু আশা ফলবতী হইল না।

রাজকক্ষটি পিরামিডের ভিত্তি হইতে প্রায় ২০০ ফুট ঊর্দ্ধে এবং ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই কক্ষটির ছাত ৯টি প্রকাণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তরের কড়ির উপরে স্থাপিত এবং ইহার এক একখানা কড়ির ওজন প্রায় ২০০০ মণ। পিরামিডের নিকটে কোনও গ্রেনাইট পাথরের পাহাড় নাই। যে যুগে বাষ্পীয় অথবা বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল সেই যুগে বহুদূর পর্ব্বত হইতে এই দুই হাজার মণ ওজনের এক এক খণ্ড প্রস্তর কি উপায়ে আনা হইয়াছিল এবং কি উপায়েই বা ভূপৃষ্ঠ

হইতে ১০০ ফুট উর্দ্ধে এগুলিকে তুলিয়া স্থাপন করিয়াছিল তাহা নিয়া বর্ত্তমান যুগের স্থপতি ও বিশেষজ্ঞগণ গবেষণাই করিতে পারেন কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারেন না। বোধ হয় উহা চিররহস্যেই আবৃত থাকিবে।

খলিফার দলের এখনো দুইটি স্থান অন্বেষণ বাকী রহিয়াছে। একটি প্রথম প্রবেশপথের যে সুড়ঙ্গটি হেলান গতিতে নিম্নগামী হইয়াছে অন্যটি ত্রিপথের সংযোগ স্থল হইতে যে গর্ত্ত সোজা নীচে চলিয়াছে। তাহারা প্রথম প্রবেশপথের সংযোগস্থলে আসিয়া হেলান গতিতে প্রায় ৩৫০ ফুট নামিবার পর একটি অসম্পূর্ণ কক্ষে উপস্থিত হইল। এই কক্ষটি লম্বায় প্রায় ৫০ ফুট দেয়াল ও ছাত সম্পূর্ণ, কিন্তু মেজে অসম্পূর্ণ এবং পাথর-কুচি ও ধূলি আবর্জ্জনায় পূর্ণ। এই কক্ষটিও পিরামিডের তলদেশে ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং কক্ষটির বিপরীত দিকের দেয়ালে একটি ছোট সুড়ঙ্গ পথ রহিয়াছে। এই সুড়ঙ্গ পথে একটি লোক অতি কষ্টে বুকে হাঁটিয়া প্রবেশ করিতে পারে। অনুসন্ধানকারী দল একে একে ঐ পথে অগ্রসর হইয়া ৬০ ফুট পর্য্যন্ত গিয়া দেখিতে পাইল পথটি ওখানেই শেষ হইয়াছে। পরে তাহারা একজনকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পূর্ব্বোক্ত মসিনিন্দিত অন্ধকার কূপ মধ্যে নামাইল। এইভাবে ৬০ ফুট নামিবার পর ছোট কক্ষ দৃষ্ট হইল তৎপরে ঐ গর্ত্ত যেন সীমাহীন অতলে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই উহার নিম্নদেশে যাওয়া অসম্ভব বিধায় পরিত্যক্ত হইল। এইভাবে খালিফা-অল-মামুনের দল পিরামিড অন্বেষণ পর্ব্ব সমাপন

করিয়া ব্যর্থমনোরথ ও ভগ্নহৃদয় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই ঘটনার পর বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইল। আরববাসিগণ প্রেতাত্মার ভয়ে মুক্তদ্বার পিরামিডের ত্রিসীমানায়ও মাড়াইল না। পরে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে নাথানিয়াল ডেভিসন নামক জনৈক ইংরেজ পিরামিডের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাজকক্ষে উপস্থিত হইলেন। বহু পরীক্ষার পর তিনি কক্ষমধ্যে চীৎকার করিয়া দেখিলেন তাঁহার চীৎকার উপরদিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তিনি প্রশস্ত গলিপথের দিক হইতে উচ্চ মইয়ের সাহায্যে পরীক্ষা করিবার সময় হঠাৎ দেখিলেন রাজকক্ষের ঠিক উপরেই আর একটি কক্ষ রহিয়াছে। এই কক্ষটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২৯ ফুট কিন্তু উচ্চতায় এত কম যে ডেভিসনকে গুপ্তধনের অন্বেষণে ইহার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনিও ঐ কক্ষে বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন ধূলি ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই কক্ষটি তাঁহার নামানুসারে পরবর্ত্তী যুগে "ডেভিসন কক্ষ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে কর্ণেল হাওয়ার্ড ভিসি নামক জনৈক সাহসী ও ধনী বৃটিশ অফিসর ৩০০ শ্রমিকসহ পিরামিড অন্বেষণে আসেন। তিনি নিজ তহবিল হইতে এই খননকার্য্যে ১০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করেন এবং বৃটিশ মিউজিয়মে বহুবিধ জিনিষ প্রেরণ করেন। তিনি ডেভিসন কক্ষের উপরে

পরপর আরও ৪টি কক্ষ আবিষ্কার করেন। এই ক্ষুদ্র কক্ষগুলি রাজকক্ষের ছাতকে লক্ষ লক্ষ টন পাথরের ওজন হইতে আংশিক অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এবং ভূকম্পনের সময় স্প্রিং বাফারের কার্য্য করার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

রাজকক্ষ এবং রাণীকক্ষ দুইটি হইতেই ৯ ইঞ্চি সমচতুষ্কোণ প্রায় ২০০ ফুট দীর্ঘ দুইটি করিয়া সুড়ঙ্গ পথ একটি উত্তরে এবং একটি দক্ষিণে পিরামিডের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া রহিয়াছে। উত্তর দিকের সুড়ঙ্গ পথে একমাত্র ধ্রুবতারাটিকে দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ দিকের সুড়ঙ্গ পথে দুইটিতেও একটি মাত্র নীল নক্ষত্র লক্ষিত হয়।

মিশরীয়গণ মমীকক্ষে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করে না, অথচ রাজকক্ষ এবং রাণীকক্ষ হইতে উত্তর দিকে যে দুইটি সুড়ঙ্গ পথ ২০০ ফুট অতিক্রম করিয়া বহির্দ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। সেগুলি এমন ভাবেই প্রস্তুত যে দুইটি কক্ষ হইতেই ছিদ্রপথে একমাত্র ধ্রুব নক্ষত্রটি দৃষ্ট হয়। ইহাতে কি উদ্দেশ্যে পিরামিড-গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই সমস্যার সমাধানে সাহায্য না করিয়া বরং জটিলতাই বৃদ্ধি করিয়াছে।

অচেনা গাছের কাহিনী

নদীর ধারে গ্রামের আঁকা বাঁকা পায়ে চলার পথ। সেই পথের ধারে হয়েছিল একটা নাম-না-জানা ছোট গাছ। পথিক যারা চলত সেই পথ ধরে, কেউ ফিরেও চাইত না তার দিকে—ভাবত বুঝি বা হবে আগাছা।

একদিন এল বসন্ত, তার রং আর তুলি নিয়ে—সারা পৃথিবীটাকে রঙিয়ে দিতে।

পায়ে-চলা পথ দিয়ে পথিক চলে। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে, সে ফিরে তাকায়,—দেখে একটা ছোট গাছ। সর্ব্বাঙ্গ তার ঢাকা ছোট ছোট বেগ্নী রং-এর ফুলে। মুহূর্ত্তকাল বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে, হয়ত বা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে শোঁকে, পথের ক্লান্তি ভুলে যায়, তারপর আবার যাত্রা সুরু করে।

গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে জল নিতে আসে। তারাও তাকায় ফিরে। কেউ একটা ফুল নিয়ে খোঁপায় গোঁজে। আবার সঙ্গিনীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে জল নিয়ে ফিরে যায়।

পাড়ার ছেলেমেয়ের দল খেলতে গিয়ে ফুল তোলে—কেউ গলায় পরে মালা গেঁথে—কেউ গোঁজে কানে।

ক্রমে কালের নিয়মে ফুলের পাঁপড়িগুলো একে একে শুকিয়ে যায়। পাতাগুলোও ঝরে পড়ে পায়ের তলায়। শুধু প্রাণহীন শুক্নো দেহটা থাকে খাড়া হয়ে।

একদিন এক দুঃখী ভাতের হাঁড়ীতে জ্বাল দেবার জন্যে তাকেও নেয় তুলে। কোন চিহ্নই তার আর অবশিষ্ট থাকল না।

আবার পথ দিয়ে চলে পথিক।

মেয়েরা আসে জল নিতে।

ছেলেমেয়েরা খেলতে আসে।

সেই পরিচয় হীন নাম-না-জানা গাছের কথা কারুর-ই আর মনে পড়ে না।

অহংকার

চলন্ত এক ঘোড়ার গাড়ীর চাকার কাছে একটা মাছি বসে ছিল। আর একটা মাছি বসে ছিল ঘোড়ার পিঠের উপর।

পিঠের মাছিকে শুনিয়ে চাকার মাছি বলল "চাকার উপর কি চোটে ধূলো উড়োচ্ছি দেখ্‌ছ!" পিঠের মাছি শুনে বলল "আমিও কি জোরে গাড়ী ছুটোচ্ছি দেখ্‌।

সর্ব্বস্কন্ধী

সর্ব্বস্কন্ধী, অর্থাৎ যিনি সকলের কাঁধেই চড়িয়া থাকেন।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের এক পুরাণো ধোপা ছিল। তাহার নাম হারা। হারা কাপড় ভালই কাচিত কিন্তু একবার কাপড় লইয়া গেলে, অনেক দিন আর কাচা কাপড় লইয়া ফিরিত না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বদাই একটা-না-একটা অজুহাত দিত। কখনও বলিত মায়ের অসুখ, কখনও বা বলিত মা মারা গিয়াছেন। বিলম্বের এই কৈফিয়ৎ সব সময় সত্য নয়—মামুলি অজুহাত মাত্র।

একবার অনেক দেরী করিয়া হারা কাপড় কাচিয়া আনিল। গ্রীষ্মকালের দুপুর বেলা। তর্কবাগীশ মহাশয় আহার করিয়া মুখ ধুইতেছেন এমন সময় ধপ্ করিয়া কাপড়ের বস্তা ফেলিবার শব্দ শুনিলেন। ধোপা কাপড় আনিয়াছে বুঝিতে পারিয়া চাকরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন "ওরে কাপড় গুণে গেঁথে নিয়ে হারাকে দূর করে দে, আর ওকে কাপড় কাচতে দিস্‌নে।"

হারা শুনিল। তার রাগও নাই দুঃখও নাই—নির্ব্বিকার। সে একটা থামের আড়ালে গিয়া চাদরের এক দিক খুলিয়া নিজের মুখে মাথায় বাতাস করিতে করিতে কাহাকে যেন শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল "আজকাল ধোপার ব্যবসা বেশ ভাল ব্যবসা হয়েছে যেখানে যাই সেখানেই আদর-যত্নের আর অবধি নেই—কেবল হাতে ধরে মারতে বাকী রাখে। তবুও পণ্ডিতের মুখে এত রাগের কথা ভাল লাগে না। এই দুনিয়ায় 'সর্ব্বস্কন্ধী'র হাত থেকে কারও নিস্তার নেই দেখছি। তা' ধোপার কষ্ট পণ্ডিতেরা বুঝবেনই বা কি করে? তাঁরা একবার যাকে পাঠ দেন সে চির

জীবন তাঁর গোলাম হয়ে রইল। পথে ঘাটে যেখানেই দেখা, গুরু বলে পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম। আর ধোপা, দরজি, যাত্রা-ওয়ালা! একবার ধরণধারণ বলে দিলাম, ইস্ত্রি ধরতে শিখালাম, অমনি সে মিস্ত্রী হয়ে দাঁড়াল। আলাদা ব্যবসা ত' খুললোই, খদ্দেরও ভাঙ্গিয়ে নিল। খলিফার কাছে এক-আধটু ছাট-কাট শিখ্‌ল ত' নিজেই দর্জ্জি হয়ে চৌমাথায় এক নতুন দোকান খুলে বস্‌ল। যাত্রার দলের বালক সেজে অধিকারীর সঙ্গে গোটা দুই আসর যদি ফিরল অমনি সে নতুন দল বেঁধে বস্‌ল। আমার সাক্‌রেদরা যদি আজ আমাকে ওস্তাদ বলে মানত, তবে আর ভাবনা কি ছিল। গঙ্গার এপারে এই হারার কাছে কাজ শেখেনি এমন ধোপাই নেই। আমায়ও আজ এক কলেজ প'ড়ো।"

হারা ধোপার এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে তর্কবাগীশ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "তোর কথার মধ্যে 'সর্ব্বস্কন্ধা' বল্‌লি, তার অর্থ ত' বুঝ্‌তে পারলাম না।"

হারা বলিল—

পথে এক গাছের তলায় বেশ ভদ্রসন্তানের মত কাপড়-চোপড় পরা একটি লোক বসেছিল। এক ব্রাহ্মণ পথিক সেই গাছতলায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি জাত।"

সে বলল—"আমি সর্ব্বস্কন্ধী।"

শুনে ব্রাহ্মণের রাগ হল—"'সর্ব্বস্কন্ধী'।—তুই সকলের ঘাড়ে চড়িস নাকি?"

লোকটি বলল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ, সকলের কাঁধেই ত' চড়ি।"

এই কথায় ব্রাহ্মণের আরও রাগ হল "তুই ব্রাহ্মণের কাঁধেও চড়িস্ ?"

"আজ্ঞে, ব্রাহ্মণ হলে ত' সকলের আগেই চড়ে থাকি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদি দেবগণের কাঁধে চড়েই আছি।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণের জ্ঞান হইল, কথায় বলে 'রাগ না চণ্ডাল।' রাগ মানুষকে চণ্ডাল করে। তখন আর তাহার হিতাহিত বোধ থাকে না। লোকটি জাতিতে চণ্ডাল অর্থাৎ রাগ সকলের কাঁধেই চাপিয়া থাকে। পুরাণ প্রভৃতিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণের কত ক্রোধের কাহিনী আছে।

ইহা শুনিয়া তর্কবাগীশ বলিলেন "হারান্ তুমি যে এত জ্ঞানী ও বহুদর্শী তা জানতাম না। আজ থেকে আমি তোমার সাক্‌রেদ হলাম। ওস্তাদ বলে মান্‌ব, কিন্তু কাপড় কাচতে পারব না। কাপড় দিতে দেরী হলে আর কখনও তিরস্কার করব না। আমি বরং আর দুই এক প্রস্থ ধুতি উড়ানী কিনে নেব। তোমার দেরী হলে আমার অসুবিধা হবে না।"

এ ঘটনা হইল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে—এখনকার মত রেশনে বরাদ্দ কাপড়ের সময় নয়। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সহজেই ধোপার অসুবিধার মীমাংসা করিতে পারিলেন।

ইহার পর হারাকে তিনি চিরকাল 'ওস্তাদজি' বলিয়া ডাকিতেন। কাপড় ধোলাই করিবার জন্য যে বেতন দিতেন তাহাও বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমিহিরবরণ সিংহ

শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা শুধু কঠিন নহে রীতিমত দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য লইয়া দেশী বিদেশী কবি সাহিত্যিক দার্শনিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সুধী জ্ঞানী ও গুণী জন তাঁহাদিগের নিজস্ব মত ও ধরণ অনুযায়ী বহু আলোচনা আজ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনায় সময় আজিও অনাগত। তাঁহারা বলেন রবীন্দ্র-প্রতিভার জ্যোতির্ম্ময় গণ্ডীর মধ্যে আমরা অবস্থান করিতেছি। দূর হইতে সমালোচকের দৃষ্টিতে ইহাকে দেখিবার সাধ্য আমাদের নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের তীব্র মধুর রস আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি এইটুকু মাত্র যে একটা নূতন কিছু আমরা আমাদের মাঝে পাইলাম, কিন্তু যাহা পাইলাম তাহাকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এখনও ইহার পূর্ণ বিকাশ ত দূরের কথা শৈশবও পার হয় নাই বলা চলে। যে আধুনিক বাংলা ভাষাকে আমরা দেখিতেছি তুলনায় তাহার নিজের বয়স খুব অল্প। ইহারই মধ্যে আধুনিকতম আগন্তুকদের মধ্যে শিশু-সাহিত্য অন্যতম। বাঙ্গালী শিশুর শৈশবের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিশেষ করিয়া সৃষ্ট সাহিত্যের প্রচলন খুবই অল্পদিন হইল হইয়াছে। অবশ্য মধ্যযুগীয় বাংলা-

সাহিত্যে যে তৎকালীন শিশুরা একেবারে কোন রসই পাইত না তাহা বলা যায় না। কেননা শিশুর মন সঞ্জীবচন্দ্র-দৃষ্ট সেই পালামৌএর অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়। সে নিতান্ত নিরস জিনিষ হইতেও আপনার মনের আনন্দের খোরাক জুটাইয়া লয়। মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে পদ্যের প্রাধান্য তাহাদিগকে এই বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু যখন বাংলা-সাহিত্যে গদ্যের যুগ আরম্ভ হইল সেই যুগসন্ধিক্ষণ ও তাহার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত শিশুদের পক্ষে বড় দুর্দ্দিন চলিয়াছিল সন্দেহ নাই। আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শব্দ ভারাক্রান্ত বাংলা-সাহিত্যের কঠিন প্রাচীরগাত্রে তাহাদের শিশুমন মাথা খুঁড়িয়া ফিরিত। যাহা হউক তিমিরময়ী অমানিশা রৌদ্রকরোজ্বল নির্ম্মল প্রভাতেরই সূচনা করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পর হইতেই বাংলা ভাষার আমূল পরিবর্ত্তন হইল।—বাংলা-সাহিত্য সম্পদে, গর্ব্বে মহিমাময়ী হইয়া উঠিল। গদ্য সাহিত্যের দ্বার দিয়া কয়েকটি নব প্রতিষ্ঠিত মাসিক-পত্রিকাকে বাহন করিয়া আবির্ভূত হইল প্রথম প্রকৃত শিশু-সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথেরও শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল এইরূপ আবহাওয়ায়। বঙ্কিমযুগের সমাপ্তি ও রবীন্দ্রযুগের আরম্ভ এক। বঙ্কিম-প্রতিভার অস্তরাগ ও বালরবির উদয়রশ্মি একত্রে মিশিয়াছিল।

যতদূর জানা যায় রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ

'বনফুল' তাঁহার কৈশোরে চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়।—সেই হইতে তাঁহার দীর্ঘজীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার লেখনী এতটুকু বিশ্রাম গ্রহণ করে নাই।

কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের সূচনাতেই সাধারণ প্রচলিত ধারার একটি মস্ত ব্যতিক্রম দেখা যায়। সাধারণ সাহিত্যিক-যশপ্রার্থী বাঙ্গালী কিশোরের গোপন সাহিত্যচর্চ্চার খাতা খুলিলে দেখা যাইবে অধিকাংশ স্থলেই তাহা শিশুপাঠ্য দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী অথবা কবিতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনায় কিশোরমনের ও হাতের ছাপ থাকিলেও মূলতঃ তাহা কিশোর-পাঠ্য নহে। কৈশোর বা যৌবনের রচনায় শিশুমনের প্রতি তিনি কোন লক্ষ্যই প্রায় করেন নাই। কবি স্বয়ং তাঁহার যে কয়খানি রচনাকে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়াছেন তাহার কয়েকখানি যৌবনের প্রান্তভাগে, কয়েকখানি প্রৌঢ় বয়সে রচিত। পরে পরপর কয়েকখানি বই 'সে', 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া' এবং 'গল্পসল্প' একরকম তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শিশুমনের উপযোগী রচনাগুলিকে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই বিভাগ অনুযায়ী 'রাজর্ষী' এবং 'সে' এই দুইখানি মাত্র গ্রন্থকে আমরা উপন্যাস বলতে পারি। 'সে'র রচনাকাল যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রান্তভাগ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অপরপক্ষে 'রাজর্ষী'

শিশু-সাহিত্যে তাঁহার প্রথম অবদান এবং প্রান্ত যৌবনের রচনা। এই দুই গ্রন্থের রচনাকালের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ব্যবধান এবং এই ব্যবধানের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে উপন্যাস দুইটিতে লেখকের চিন্তাধারা ও লেখনভঙ্গীতেও যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান। 'রাজর্ষী' একটি উদ্দেশ্য লইয়া রচিত।—অর্থাৎ লেখকের একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আছে। ঘটনা পরম্পরায় কাহিনীটি ক্রম পরিণতি লাভ করিয়া অবশেষে সমাপ্তিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু 'সে' "সে" নামধেয় কোন এক ব্যক্তি, যে কিনা পৃথিবীর সমস্ত তৃতীয় পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, তাহার নানা অভিযান কাহিনী লইয়া রচিত। কাহিনীগুলির পরস্পর বিশেষ কোন পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নাই। এ শুধু পুপুদিদির ফরমাসে কবিগুরুর মানুষ-গড়া খেলা।

রাজর্ষীর মূল সুরটি স্বপ্নের ভিতর দিয়া লাভ করিবার ইতিহাস অনেকেরই জানা। সুরটি বাংলা-সাহিত্যে অভিনব হইলেও গ্রন্থখানি গতানুতিকতার হাত একেবারে এড়াইতে পারে নাই। তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুসারে গ্রন্থকার লব্ধ সুরটিকে রূপ দিবার জন্য ইতিহাসের আশ্রয় খুঁজিয়াছেন। ফলে 'রাজর্ষীর' কাহিনীটি এক আধা-ঐতিহাসিক কাঠামোর উপর স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য ঐতিহাসিক সত্যাসত্য আমাদের মনোযোগ বিশেষ আকর্ষণ করে না। পরে এই উপন্যাসেরই মূল সুরটি পরিণত রূপ গ্রহণ করিয়াছে 'বিসর্জ্জন' নাটিকায়। 'বিসর্জ্জন' আমাদের এই আলোচনার অন্তর্গত নহে। তবে, 'রাজর্ষী' ও

'বিসর্জ্জনের' মধ্যে যে অসংখ্য প্রভেদ বর্ত্তমান তাহার প্রধান দুইটির উল্লেখ আমরা এইখানে করিতে পারি। যে প্রভেদটি সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা 'বিসর্জ্জনে' ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ততা। 'রাজর্ষীর' মাত্র প্রথম অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরও দুই একটি পরিচ্ছেদ হইতে বিসর্জ্জনের আখ্যানভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে। মূল সুরকে ছাড়াইয়া 'রাজর্ষী'তে কাহিনীর অযথা দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'রাজর্ষী'র ভূমিকায় একস্থানে বলিতেছেন—"আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিকপত্রের পেটুকদাবী সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যাঞ্জনের পদসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হল। বস্তুত উপন্যাসটি শেষ হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে।" দ্বিতীয় প্রভেদ যেটি লক্ষ্য করা যায় সেটি 'রাজর্ষী' এবং 'বিসর্জ্জনে'র নায়কের বিভিন্নতা। 'রাজর্ষীতে' গোবিন্দমাণিক্যকে আমরা নায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, এবং জয়সিংহ একটি আনুসঙ্গিক চরিত্র; কিন্তু বিসর্জ্জনে জয়সিংহ আরও পরিণতি লাভ করিয়া নায়কের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। অপরপক্ষে গোবিন্দমাণিক্য সেখানে পার্শ্বচরিত্র মাত্র।

'রাজর্ষী' বিকাশোন্মুখ প্রতিভার নিদর্শন হইলেও পরিণত লেখনীর রচনা নহে। পরবর্ত্তী যুগের তুলনায় চরিত্র সৃজনী ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। নিজের এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গণ্ডীবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে

লিখিবার সম্বল পাইব কোথায়?……তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্য পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশী।” জীবনের অভিজ্ঞতার স্বল্পতার পরিচয় 'রাজর্ষী'র চরিত্রগুলিতে পাওয়া যায়। চরিত্র বিচার অথবা বিশ্লেষণ আমাদের এই আলোচনার অন্তর্গত নহে। তবে, সাধারণভাবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, উপন্যাসের চরিত্রকে স্বাভাবিক করিতে হইলে মানব চরিত্র সুলভ বিভিন্ন আদর্শ ও প্রকৃতির মানসিক দ্বন্দ্বকে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ফুটাইয়া তোলা প্রয়োজন। জটীলতা ও বিরোধের অনুপস্থিতিতে চরিত্র জীবন্ত হইতে পারে না। 'রাজর্ষী'র চরিত্রগুলির অধিকাংশই সহজ, সরল ও জটীলতাবিহীন।—যেন ভাল মন্দ এক একটি বিশেষ গুণকে মনুষ্যরূপ দান করা হইয়াছে। একমাত্র রঘুপতি চরিত্রে আমরা পাই জীবনের পরিপূর্ণ আভাষ। অন্তরের পরস্পরবিরোধী আদর্শের সংগ্রাম রঘুপতিকে প্রাণময় করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করে। তাই শেষ পর্য্যন্ত উপন্যাসটির নায়কত্বের দাবী লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে রাজর্ষী গোবিন্দমাণিক্যের সহিত রাজপুরোহিত রঘুপতির।

রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রহসনগুলির অন্তর্গত 'হাস্য কৌতুক' 'রাজর্ষী'র সমসাময়িক। এই প্রহসনাত্মক নাটিকাগুলি ইউরোপে প্রচলিত charadeএর অনুসরণে রচিত হয়। এই নাটিকাগুলি হেঁয়ালী নাট্য নাম ধরিয়া শিশু-পত্রিকা 'বালক' ও 'ভারতী'তে সর্ব্ব

প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমস্ত নাটিকাগুলির রসগ্রহণ ক্ষমতা শিশুপাঠকের না থাকিলেও অধিকাংশ পড়িয়াই তাহারা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিবে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার ব্যাপ্তি কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নহে। তাহার বিকাশ বাংলা-সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায়। কিন্তু তাঁহার কবিরূপটিই ধরা পড়িয়াছে সব চাইতে বেশী। তাঁহার প্রতিভার সকল দিক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কবি-প্রতিভা। পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ও ঋষি রবীন্দ্রনাথকে ম্লান করিয়াছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং শিশু-সাহিত্যেও তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান যে কাব্যই হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

এই পর্য্যায়ে 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথের' নাম আমাদের মনে আসে সর্ব্বাগ্রে। 'শিশু' তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনা। মাতৃহীন পুত্রকন্যাকে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে কবিতাগুলির সৃষ্টি। কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি শিশুমনের উপভোগ্য, আর কতকগুলি কবির দার্শনিকতায় ভরা। সেই সব কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পাঠক ও শ্রোতা কবিতার ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া যান। কবি যেমন একদিকে শিশুর চিত্তের তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি শিশুর পিতামাতার মনস্তত্ত্বও ধরিয়া দেখাইয়াছেন। 'শিশু ভোলানাথ' 'শিশু'র অনেক পরবর্ত্তীকালের রচনা হইলেও উভয়েই একই শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহাদের রচনার ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রচুর।

তবে 'শিশু ভোলানাথের' কবিতাগুলিতে দার্শনিকতার প্রভাব আরও বেশী। রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রান্তভাগে আরও দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়—'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি' তাহারা বিশেষ করিয়া শিশুদের জন্যই সৃষ্ট। 'ছড়ার ছবির' ভূমিকায় কবি শিশুমনের পক্ষে গ্রন্থান্তর্গত কবিতাগুলির দুর্বোধ্যতার কৈফিয়ৎ দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটীল যদি কোনটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।" ইহা যতটা প্রযুয্য 'ছড়ার ছবি' ও 'খাপছাড়া' সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' সম্বন্ধে। ছন্দ-বৈচিত্রে ও ধ্বনি মাধুর্য্যে এই দুইখানি গ্রন্থ দার্শনিকতার প্রভাবে দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও শিশুমহলে বড় প্রিয় বড় আপনার। যে কোন শিশুর কলকণ্ঠে 'শিশু ভোলানাথের' 'রাজা ও রাণী' কবিতাটির আবৃত্তি শুনিলেই আমাদের সকল তর্কের মীমাংসা হইয়া যায়। 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি' তুলনায় এত জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। 'খাপছাড়া' ও 'ছড়ার ছবি' এই দুইখানির রচনাধারার মধ্যে পার্থক্য আছে। 'খাপছাড়া' কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হেঁয়ালী কবিতা সমষ্টি। কবিতাগুলির প্রকৃতি পুস্তকটির উৎসর্গ পত্রের কবিতাটিতেই কবি পরিস্ফুট করিয়াছেন। 'ছড়ার ছবি' কাহিনী প্রধান, হেঁয়ালীর প্রাধান্য বিশেষ নাই।

আর একখানি কাব্য 'কথা ও কাহিনী' (যাহা প্রকৃতপক্ষে

'কথা' নামক একখানি গ্রন্থ এবং অপর কয়েকটি কবিতার সমষ্টি) শিশুমহলে আপনার আসল কায়েমী করিয়া লইয়াছে। যদিও ইহার সব কবিতাগুলিই শিশুপাঠ্য কী না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রসঙ্গক্রমে 'পরিশোধ' কবিতাটির উল্লেখ করা যায়। এই কবিতাটির আখ্যান ভাগই পরে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু যোগাইয়াছে যাহার উপরে শিশুমহলের স্পষ্টই কোন দাবী নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থখানিকেও অনায়াসে শিশু-পাঠ্যের অন্তর্গত করা যায় যদিও শিশুমহলে 'কণিকা' বিশেষ পরিচিত নহে। তবে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকগুলিতে মাঝে মাঝে 'কণিকার' দুই একটি কবিতার দেখা মেলে। ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য অনেক কাব্য গ্রন্থেরই কোন কোন কবিতা পড়িয়া শিশুরা উপভোগ করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি পাঠ্য-পুস্তকেরও রচয়িতা। এইগুলির মধ্যে 'সহজ পাঠ', 'পাঠ সঞ্চয়', 'ছুটির পড়া' এবং 'বিশ্ব পরিচয়ের' নাম আমরা জানি। ইহাদের মধ্যে 'সহজ পাঠ' এবং 'বিশ্ব পরিচয়' নূতন সৃষ্টি; আরগুলি সংকলন। 'ছুটির পড়ায়' প্রকাশিত গল্প 'মুকুট' পরে পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাটকাকারে পৃথক পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। 'সহজ পাঠ' বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত 'বর্ণ পরিচয়' পুস্তক-মালার অনুসরণে রচিত এবং কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। ইহার মূল উদ্দেশ্য হয়ত বিশেষ সফলতা লাভ করে নাই তবে সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 'বিশ্ব পরিচয়' রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনা। ইহা শিশুপাঠ্য হইলেও

নিতান্ত অল্প বয়স্কদের জন্য নহে। এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থখানিতে তিনি বিজ্ঞানের কয়েকটি দুরূহ বিষয় তাঁহার অনুপম বর্ণনা-ভঙ্গীর সাহায্যে সহজ করিয়া বুঝাইয়াছেন।—'বিশ্ব পরিচয়' তাহার মূল উদ্দেশ্যেও যেমন সফলতা লাভ করিয়াছে সাহিত্য ক্ষেত্রেও স্বীয় আসন তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

'ছেলেবেলা' একাই একটি শ্রেণী রচনা করে। কেননা ইহাকে অন্য কোনও ধরাবাঁধা শ্রেণীতে ফেলা যায় না। 'ছেলেবেলাকে' 'জীবন স্মৃতির' প্রথম অংশের পুনর্লিখন বলা যাইতে পারে।—ছোটদের জন্য নূতন ধরণে নূতন ভাষায় কবির ছেলে-বেলার গল্প বলা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প রচয়িতা। তাঁহার ছোট গল্পগুলি একত্রে 'গল্পগুচ্ছ' নামে তিন খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও শিশুদের জন্য তিনি এই গল্পগুলি রচনা করেন নাই, তবুও তাহাদের পাঠোপযোগী কয়েকটি গল্প আমরা 'গল্পগুচ্ছে' পাই। উদাহরণ স্বরূপ 'ছুটি', 'কাবুলীওয়ালা' এবং 'ইচ্ছাপূরণের' নাম করা যাইতে পারে।

'গল্পসল্প' রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনা। 'সে'র মতই পুপুদিদিকে গল্প বলার খাতিরে এর জন্ম। ইহাকে শিশু-সাহিত্যের ভিতরে ফেলিলেও অধিকাংশ জায়গাতেই সূক্ষ্ম বিদ্রূপের প্রাধান্য বলিয়া ছোটরা সর্ব্বত্র এর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁহার গীতধর্ম্মী নাটিকাগুলি। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রকৃতপক্ষে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত না হইলেও শিশুদের পাঠোপযোগী বলা যাইতে পারে। নাট্যগুলির অন্তর্নিহিত ভাবটির প্রতি শিশু পাঠকের মন সাড়া না দিলেও তাহাদের সুরটি তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করে। আর কিছু না হউক তাহাদের বহিরাবরণের সৌন্দর্য্য তাহাকে মুগ্ধ করিতে বাধ্য। নাট্যগুলি শিশুদেরই জন্য সৃষ্ট না হইলেও তাহারা একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই।

নাটিকাগুলির অধিকাংশই রচিত হয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের অভিনয়ের জন্য, এবং যেগুলি তাহা হয় নাই সেগুলিও আশ্রম বালকদের সহায়তায় একাধিক বার অভিনীত হইয়াছে এবং হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতধর্ম্মী নাটিকাগুলির মধ্যে 'শারদোৎসব' রচিত হয় সর্ব্বপ্রথম। 'শারদোৎসবের' বিভিন্ন চরিত্র পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য বহু চরিত্রের উপাদান যোগাইয়াছে। বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে হয়ত 'শারদোৎসবের' উপনন্দের সহিত 'ডাকঘরের' অমল, 'অচলায়তনের' পঞ্চক কিংবা 'মুক্তধারার' অভিজিতের কোনও মিল নাই। কিন্তু এই কয়টি চরিত্রে কোথায় একটি ঐক্যের সুর আছে যাহা পাঠকের মনের একটি তারেই বারে বারে ঝঙ্কার তোলে। এই নাটিকাগুলির ইহা একটি মস্ত বিশেষত্ব।

নাটিকাগুলি সমস্তই রূপক। প্রত্যেকটিই রূপকের ভিতর

দিয়া এক একটি বিশেষ ভাব বহন করিতেছে। এই অন্তর্নিহিত ভাবের গভীরতা ও সৌন্দর্য্যেই নাটিকাগুলির প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু শিশুমন গভীরতা ভালবাসে না—তাহারা আপন শৈশব-চাপল্যে সব কিছুকেই হাল্কা করিয়া লয়। এই ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। রূপকের মায়াজাল ভেদ করিয়া গূঢ় অর্থ বাহির করিবার জন্য তাহাদের কোনও আগ্রহ নাই। প্রকৃতপক্ষে রূপকের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তাহারা সম্পূর্ণ অচেতন। কাজে কাজেই রূপক নাটিকাগুলির রূপক রূপটি লইয়া কোনও আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কাহিনী মাধুর্য্যেব পরেই শিশুমনকে সর্ব্বাপেক্ষা নাড়া দেয় কাহিনী-অন্তর্গত চরিত্রগুলি। কবিরাজের নিষেধে বাহির প্রকৃতি হইতে ছিনাইয়া আনা রোগশীর্ণ অমলের প্রতি তাহাদের চিত্ত সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া আসে।—আবার নিষেধের বেড়া ভাঙ্গা বিদ্রোহী পঞ্চকের গানের ছন্দে তাহাদের অশান্ত মন নাচিয়া উঠে।

উপনন্দ এবং যুবরাজ অভিজিৎকে একদিক হইতে বিচার করিলে 'শারদোৎসব' ও 'মুক্তধারার' নায়ক বলা যাইতে পারে। গীতধর্ম্মী নাটকগুলি যে একটি করিয়া সুরের বাহক তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই নাটিকা দুইটিতে যুবরাজ এবং উপনন্দকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত ঘটনাস্রোত আবর্ত্তিত হইতেছে। আবার মূল সুরের কেন্দ্রস্থলও অভিজিৎ ও উপনন্দই। দুই ভিন্ন পথের পথিক, চরম ত্যাগী,—এই দুই তরুণের চরিত্রের মহত্ত্ব

ও ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব শিশুরা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও অভিজিতের উৎপীড়িত প্রজার জন্য, নির্য্যাতীত পরাধীন দেশের জন্য বন্দী মুক্তধারার ঋণশোধের জন্য মহাকালের উদ্দেশে নিরুদ্দেশ যাত্রা ; উপনন্দের স্বীয় প্রভুর ঋণশোধের জন্য নিজেকে ছুটির আনন্দ হইতে বঞ্চিত করা তাহাদের সহানুভূতিশীল হৃদয় নিশ্চয়ই স্পর্শ করে।

এই নাটিকাগুলির মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। সর্ব্বদাই আমরা দেখিতে পাই দুইটি আদর্শের মধ্যে বিরোধ এবং এই বিরোধের মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্যের আলো। সত্যাসত্যের দ্বন্দ্ব, ত্যাগ ও কার্পণ্যের বিরোধ, ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের যুদ্ধ—সর্ব্বত্র ইহাই রচনা করিয়াছে মূল আখ্যান ভাগ। 'শারদোৎসবে' দেখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে ত্যাগী উপনন্দের সহিত কৃপণ লক্ষেশ্বরের। 'অচলায়তনে' বিরোধ বাধে সত্য পথের পথিক পঞ্চক-দাদাঠাকুরের সহিত পথভ্রান্ত মহাপঞ্চক ও আচার্য্যের। 'মুক্তধারাতে' আসেন যুবরাজ অভিজিৎ তাঁহার ঔদার্য্য, মহত্ত্ব ও ত্যাগকে সম্বল করিয়া ;—দ্বন্দ্ব সুরু হয় সংকীর্ণচেতা, ক্ষুদ্রবুদ্ধি কার্পণ্যের প্রতিমূর্ত্তি রাজা ও নির্ম্মম যন্ত্র শক্তির প্রতীক বিভূতির সহিত। আবার 'ডাকঘরে'ও পুনরাবৃত্তি হয় সেই একই কাহিনীর। একদিকে থাকে পার্থিব সামর্থ্যে দুর্ব্বল কিন্তু শাশ্বত সম্পদের অধিকারী বালক অমল, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় শক্তিমদ গর্ব্বিত মোড়ল ও মূর্খ কবিরাজের দল। 'ফাল্গুনী'তে কিছু পরিবর্ত্তন আসে।—সেখানেও চলে বিরোধ,

সেখানেও দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সে কোনও দুইটি দলের মাঝে নয়। অথবা দুইটি আদর্শের সংগ্রাম নয়। 'ফাল্গুনী' ঘোষণা করে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের জয়লাভ।

দুই আদর্শের বিরোধ, সত্যাসত্যের এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ঠাকুরদাদা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন মূর্ত্তিমান সত্যের উজ্জ্বলরূপে। বিশ্ববাসী যেখানেই পথ হারাইয়াছে তিনি সেখানেই দেখা দিয়াছেন পথপ্রদর্শকরূপে। তাঁহার গানের সুরে আঁধারের বুক চিরিয়া দেখা দিয়াছে আলোকের পথ।—এই ঠাকুরদাদা চরিত্র রবীন্দ্র তথা বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। এই ঠাকুরদাদাকে আমরা পাই দাদাঠাকুররূপে শোনপাংশু দলের বিদ্রোহী নেতা হিসাবে। এই ঠাকুরদাদাই আবার আসেন অমলের রোগশয্যা পার্শ্বে। বাউল-সন্ন্যাসী ধনঞ্জয় বৈরাগীর বেশে তাঁহাকে দেখি উৎপীড়িত প্রজাগণের প্রতিনিধিরূপে। এই বৃদ্ধ জীবনের চলার পথে অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছেন, বিশ্বের অনন্ত রহস্যের খবর তাঁহার কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।—তাই তিনি সাংসারিক মানুষের সংগ ছাড়িয়া আসিয়া জুটিয়াছেন শিশুর দলে। শিশু মনের মাঝেই তিনি দেখিয়াছেন বিশ্বরূপের প্রকাশ।

এই ঠাকুরদাদা যেন কবিরই মানসমূর্ত্তি। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের শিশুর মেলায় মিশিবার, সংসার ভুলিবার গোপন আকাঙ্ক্ষা রূপ ধারণ করিয়াছে এই ঠাকুরদাদা চরিত্রে। কিন্তু বিদ্বজ্জন সংঘ ও তাঁহার বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্ব, তাঁহার

এ ইচ্ছা পূরণের অবকাশ দেয় নাই।—চিরসুন্দরের দেখা তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্ত গাহিয়া উঠিয়াছিল—

"আমার নয়ন-ভুলানো এলে
আমি কি হেরিলাম নয়ন মেলে।"

কিন্তু তাহা নিতান্তই সঙ্গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে; শিশুর দলের কলকণ্ঠ তাঁহার সেদিনের গানে যোগদান করে নাই।

তবুও তিনি আমাদেরই কবি, ঠাকুরদাদা না হইলেও গুরুদেব। শিশুদের যে কোনও উৎসবে, আনন্দে তাঁহার সৌম্য সুন্দর মূর্তি আমাদের মানসলোকের স্বর্ণ-সিংহাসনে বিরাজ করিবে।



সাঁওতাল মেয়ে

একটি জাপানী গল্প

—লাফ্‌ক্যাডিয়ো হার্ন।

অনেকদিনের কথা। জাপানের একটি গ্রামে এক দরিদ্র কৃষকদম্পতি বাস করিত। গরীব হইলেও তাহারা খুব সাধু-প্রকৃতির লোক ছিল। তাহাদের ছোট ছেলেটি একটু রোগাধরণের ছিল, তাই তাহাকে চাষবাসের কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তবে ছেলেটি তাহার ভাইবোনদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুর ও বুদ্ধিমান ছিল। তাহার পক্ষে কোন শক্ত কাজ করা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাহার পিতামাতা তাহাকে গ্রাম্য মন্দিরের যাজকের কাজ শিখাইতে মনস্থ করিলেন। তাহাকে গ্রামের পুরোহিতের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি অত্যন্ত কোমল অন্তঃকরণের লোক ছিলেন। দুঃস্থ কৃষকদম্পতির অনুরোধে এবং ছেলেটীকেও খুব চালাক চতুর দেখিয়া তিনি তাহাকে সহকারীরূপে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটী যাজকের কাজকর্ম্ম শিখিয়া ফেলিল। সব বিষয়ে ছেলেটি খুব বাধ্য ছিল কিন্তু তাহার একটি দোষ ছিল। সে সর্ব্বদাই বিড়ালের ছবি আঁকিতে ভালবাসিত। পড়ার সময় অথবা কাজের সময় একটু সামান্য অবসর পাইলেই সে বিড়ালের ছবি আঁকিতে লাগিয়া যাইত। পরে এমন এক সময় আসিল যখন একমুহূর্ত্তও সে বিড়ালের ছবি না আঁকিয়া থাকিতে পারিত না। আর ছবিও সে চমৎকার আঁকিতে পারিত। বড়, ছোট নানাধরণের নানা প্রকৃতির বিড়াল সে অনায়াসে আঁকিয়া

ফেলিত। তাহার অঙ্কিত বিড়ালগুলি জীবন্ত বিড়ালের মত দেখাইত।

গ্রামের মন্দিরের দেওয়াল, মেঝে, পর্দ্দা সমস্তই সে বিড়ালের ছবিতে ভরিয়া ফেলিল। এমনকি সে ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের পাতার ফাঁকেও ছবি আঁকিতে ছাড়িল না। মন্দিরের পুরোহিত তাহাকে একদিন ডাকিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে ভাবী যাজকের পক্ষে এইরূপ চপলতা মোটেই শোভা পায় না। কিন্তু এই সাবধানবাণীতে কোনই ফল হইল না। তারপর একদিন যখন সে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধের মূর্ত্তির পশ্চাতে স্থাপিত পর্দ্দার উপর বিড়ালের ছবি আঁকিল তখন পুরোহিতের অসহ্য বোধ হইল। তিনি বালকটীকে ডাকিয়া বলিলেন "বাপু হে! যাজক হওয়া তোমার কর্ম্ম নহে। হয়তো তুমি বড় শিল্পী হইতে পার কিন্তু যাজক নহে। তুমি অদ্যই আমার মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাও। যাওয়ার পূর্ব্বে তোমাকে একটা উপদেশ দিতেছি, কখনও ইহা ভুলিও না। উপদেশটী হইতেছে—বৃহৎ স্থান সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিও, ক্ষুদ্র স্থানে আশ্রয় নিও।"

বালক কিন্তু এই উপদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে মন্দির পরিত্যাগের জন্য তাহার বাক্স বিছানা গুটাইতে লাগিল আর পুরোহিতের উপদেশের কথা ভাবিতে লাগিল। পুরোহিতকেও সে এই কথার মানে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। দ্বিপ্রহরের দিকে পুরোহিতকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া সে মন্দির পরিত্যাগ করিল।

পথে যাইতে যাইতে সে ভাবিতে লাগিল এখন সে কি করিবে। যদি সে বাড়ী ফিরিয়া যায় তবে পুরোহিতের আদেশ অমান্য করিবার জন্য তাহার পিতা তাহাকে শাস্তি দিবেন; কাজেই বাড়ী যাইতেও তাহার ভরসা হইল না। হঠাৎ তাহার এই গ্রাম হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত কোন এক গ্রামের এক বৃহৎ মন্দিরের কথা মনে পড়িল। ঐ গির্জ্জায় বহু শিক্ষার্থী যাজক এবং পুরোহিত থাকে বলিয়া সে শুনিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সে ঐ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল।

যখন সে ঐ গ্রামে গিয়া পৌঁছিল তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীরা তখন সকলেই নিদ্রামগ্ন। কিন্তু পাহাড়ের উপর অবস্থিত মন্দিরের আলো সে দেখিতে পাইল। বালকটী মন্দিরের দিকে রওয়ানা হইল।

এই মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে যাহা বালকটির জানা ছিল না। গ্রামে পৌঁছিতে রাত্রি হওয়ায় কেহ তাহাকে ঐ কাহিনী বলিয়াও দেয় নাই। ঐ মন্দিরটী আজ বহুদিন যাবৎ বন্ধ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন প্রাণী ইহার ধার দিয়া যাইতেও সাহস করে না। অথচ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এই মন্দিরে সতত ধূমধাম লাগিয়া থাকিত। এক বীভৎস দৈত্যই এই মন্দিরের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ। একদিন কোথা হইতে এই দৈত্য আসিল; যুদ্ধে মন্দিরের সকলকে পরাজিত ও নিহত করিল এবং মন্দিরের উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিল। তারপর হইতে গ্রামবাসীরা ভয়ে মন্দিরের কাছেও আসে না। রাত্রিতে

তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত পথিককে আকৃষ্ট করিবার জন্য ঐ দৈত্য মন্দিরে আলো জ্বালাইয়া রাখিত। পথিক মন্দিরে প্রবেশ করিলেই সে তাহাকে হত্যা করিত।

বালক ঐ সব কাহিনী কিছুই জানিত না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মন্দিরে আলো দেখিয়া তাহার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সে কোন কিছু না ভাবিয়া মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রাঙ্গণে এদিক সেদিক ঘুরিয়া সে একটা বড় ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ ঘরটী হইতে আলো বাহির হইতেছিল। বালক অতি সন্তর্পণে দরজায় ধাক্কা দিল কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। আর একটু জোরে ধাক্কা দিতেই দরজাটী খুলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া সে দেখিতে পাইল যে ঘরটী প্রকাণ্ড বড়। ঘরে প্রচুর আসবাবপত্র আছে, কিন্তু সব কিছুই ধূলাবালিতে পূর্ণ। সে একটি খাটে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার নজরে পড়িল, ঘরের একপাশে একটি বড় পর্দ্দা টাঙ্গান রহিয়াছে। তখনি তাহার বিড়ালের ছবি আঁকিতে ইচ্ছা হইল। সে একটি খড়িমাটি লইয়া পর্দ্দার উপর বড় বড় কয়েকটি বিড়াল আঁকিয়া ফেলিল। রাত্রিও গভীর হইয়া আসিল। বালক খাটের উপর শুইয়া পড়িল। অকস্মাৎ তাহার পুরোহিতের কথা মনে পড়িয়া গেল—বৃহৎ স্থান সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিও, ক্ষুদ্র স্থানে আশ্রয় নিও। সে তৎক্ষণাৎ খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। কারণ এই বৃহৎ ঘরে থাকা সে গুরুর আদেশের বিরুদ্ধ কাজ বলিয়া মনে করিল। সে কাছেই

একটা ছোট ঘরে গিয়া আশ্রয় নিল এবং ভাল করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। খানিকক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতকক্ষণ ঘুমাইয়াছিল ছেলেটী তাহা বুঝিতে পারিল না। হঠাৎ এক বিকট চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপ বীভৎস চীৎকার সে জীবনে কখনও শুনে নাই। একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার যেন কাহার সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে আর আক্রোশে গগনভেদী চীৎকার করিতেছে। ছেলেটী তো ভয়ে অস্থির। সে খাটের তলায় গিয়া একধারে গুটিশুটি মারিয়া পড়িয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সব কিছু একেবারে থামিয়া গেল। চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। ছেলেটী কিন্তু তখনও উঠিয়া আসিতে সাহস পাইতেছে না। আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

ক্রমে ভোর হইয়া আসিল। ছেলেটী ভয়ে ভয়ে ঘরের বাহিরে আসিল এবং অতি সন্তর্পণে বড় ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল। সবিস্ময়ে সে দেখিল যে একটা প্রকাণ্ড ইঁদুরাকৃতি দৈত্য রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

কিন্তু কে ঐ দৈত্যকে মারিল? বাহির হইতে তো কেহ আসে নাই। ভাল করিয়া চারিদিক দেখিবার পর সে বুঝিতে পারিল যে তাহার অংকিত বিড়ালরাই ঐ দৈত্যকে মারিয়াছে। কারণ সে দেখিতে পাইল যে প্রত্যেক বিড়ালের মুখেই রক্তের

দাগ রহিয়াছে। অর্থাৎ ইঁদুর-দৈত্য বিড়ালগুলিকে সত্যসত্যই জীবিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল এবং আক্রোশে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু বারে বারে ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খাইতে খাইতে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মারা গেল।

এই বালক উত্তরকালে জাপানের একজন বড় শিল্পী হইয়াছিল। এখনও জাপানে গেলে ঐ শিল্পীর অঙ্কিত বিড়ালের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

অনুবাদক—শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

অর্দ্ধ গ্লাস পানীয় জল দেওয়া হইল।

নৈরাশ্যবাদী বলিল—আমাকে মোটে আধ গ্লাস জল দেওয়া হইল।

আশাবাদী বলিল—ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি পূর্ণ আধ গ্লাস জল পাইলাম।

কিশোর বার্ণার্ড শ

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১)

বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'য়ের বাল্যজীবন অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। শ যে একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বী হিসাবে পূজা পাইবেন একথা অন্য কাহারও তো দূরের কথা শ নিজেও জানিতেন না। শৈশবেই ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বলিয়া যে প্রবাদ আছে শ'য়ের জীবনে তাহা খাটে নাই। আমরা এই মহামানবের বাল্য ও কৈশোরের পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ পরিবার সর্ব্বপ্রথম আয়র্ল্যাণ্ডে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। শ পরিবার হইতে অনেকে পাদরী, লর্ড, ব্যাঙ্কার এবং সরকারী চাকুরে হইয়াছেন। কাজেই এই পরিবার যে খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবার তাহা গোড়া হইতেই জানা যায়। এই পরিবারের লোকেরা "আমি শ'য়েদের" এই কথা বলিতে অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিতেন।

বার্ণার্ড শ'য়ের পিতা জর্জ্জ কার শ অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি বিদ্রূপ করিতে ভালবাসিতেন। একবার জর্জ্জ কার ও তাঁহার এক বন্ধু সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া শস্যের ব্যবসা আরম্ভ করেন। দু'জনের কাহারও

বিন্দুমাত্র ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না। কাজেই যাহা হইবার তাহাই হইল। জর্জ্জ কার ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু তাঁহার বন্ধু এই গুরুতর ক্ষতিতে একেবারেই মুসড়াইয়া পড়িলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। জর্জ্জ কারের ইহাতে ভীষণ হাসি পাইল। কিন্তু পাছে বন্ধু বিরক্ত হন এই ভয়ে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং মাঠে এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন। বার্ণার্ড শ পিতার এই বিদ্রূপ-প্রিয়তা পরিপূর্ণভাবে পাইয়াছেন।

বার্ণার্ড শ'য়ের মাতার নাম এলিজাবেথ। এলিজাবেথের তিনটী সন্তান হইয়াছিল। প্রথম দু'টি মেয়ে এবং তৃতীয় সন্তান জর্জ্জ বার্ণার্ড শ ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই ডাবলিন সহরে জন্মগ্রহণ করেন।

বার্ণার্ড শ ও তাঁহার বোনেরা চাকরদের তত্ত্বাবধানেই মানুষ হইতেন। পিতামাতার সঙ্গে দিনান্তেও একবার দেখা হইত না। মাতা এলিজাবেথ কখনও শ'য়েদের সংসারে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই। কাজেই স্বামীপুত্রের প্রতি তাঁহার বিরাগ না থাকিলেও খুব অনুরাগ ছিল না। কখনও তিনি তাঁহাদের নিকট ধরা দিতেন না।

পিতা যখন পুত্রের সঙ্গে মিশিতেন তখন খুব খানিকটা হৈ চৈ করিতেন এবং নানা বিষয়ে উপদেশ অথবা উৎসাহ দিতেন। তিনি সবসময়েই পুত্রকে বলিতেন যে মদ খাওয়ার মত খারাপ জিনিষ

আর নাই। খুব সম্ভবতঃ এইজন্যই শ জীবনে মদ্য স্পর্শ করেন নাই।

পিতামাতার এই অবহেলার ফলে শ নিজের মতেই মানুষ হইতে লাগিলেন এবং "চিন্তা করিতে শিখিবার পূর্ব্বেই আমি স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি হইয়া উঠিলাম।"

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ তাঁহার নিজের বাল্যজীবন সম্পর্কে বলিয়াছেন "বাবা, মা কখনও আমাকে কড়া কথা বলিতেন না। অবশ্য কড়া কথা বলার মত সৎসাহস তাঁহাদের ছিল না। আমি যা' খুশী করিয়া বেড়াইতাম। কেহ আমাকে কিছু বলিত না। আমি নিজেই গিয়া রান্নাঘরে খাইতাম। কোন কোন সময় বাবাও আমার সঙ্গে খাইতে বসিতেন। ছেলেবেলায় খুব সম্ভবতঃ বাবা পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই বলিয়া আমাকে জোর করিয়া খাবার খাওয়াইতেন। আমার পেট ফাটিয়া যাইতেছে তথাপি বাবা সন্দেহ করিতেন যে আমার বোধ হয় পেট ভরে নাই। মা কদাচিৎ রান্নাঘরে আসিতেন। তিনি আসিলে নিজের হাতে আমাকে খাওয়াইতেন। তখন আমার খুবই আনন্দ হইত। মা কদাচিৎ আমাকে তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতেও লইয়া যাইতেন। আমাদের ভাইবোনদের ইহা এক মহা সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। একটা ঝি আমাকে বেড়াইতে লইয়া যাইত। মা তাহার উপর কড়া নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে আমাকে যেন খোলা জায়গায় লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু সে কখনও মায়ের এই আদেশ পালন করিত না।"

সাংসারিক কার্য্য হইতে দূরে সরিয়া থাকিলেও শ'য়ের মাতা কখনও সঙ্গীতজগৎ হইতে সরিয়া থাকেন নাই। তিনি অত্যন্ত সুকণ্ঠী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ হইত। জর্জ্জ জন লী নামক একজন অদ্ভূত সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন। অন্য সকলে যেভাবে গান শিখাইতেন তিনি সেই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিতেন না। তাঁহার একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। এলিজাবেথ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। এই সঙ্গীতশিক্ষক বহুদিন শ'য়েদের বাড়ীর একটা অংশ ভাড়া করিয়া ছিলেন। বার্ণার্ড শ'য়ের শৈশবজীবনের উপর তিনি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শ তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন "এই বৃদ্ধের সঙ্গীত ছাড়াও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। তিনি আমাকে বলিতেন যে দরজা জানালা খুলিয়া সকলের নিদ্রা যাওয়া উচিত। আমি এখন পর্য্যন্ত সেই নির্দ্দেশ পালন করিয়া আসিতেছি। তাঁহার ডাক্তারদের উপর কোনই বিশ্বাস ছিল না। একবার আমার মা খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। বাবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ঐ বুড়ো কিছুতেই ডাক্তার আনিতে দিবেন না। প্রায় সপ্তাহখানেক পর মায়ের অবস্থা যখন খুব খারাপ হইয়া উঠিল তখন বাবা এক ডাক্তার নিয়া আসিলেন এবং অতি কষ্টে মাকে বাঁচান হইল।"

(২)

শিশু বার্ণার্ড শ এইভাবে পিতামাতার অনাদরের মধ্য দিয়া বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। এইবার

হইতে তিনি বহির্জগৎ সম্পর্কেও ভাবিতে শিখিলেন। কেহ মারা গেলে খবরের কাগজওয়ালারা যে কাল বর্ডার দিয়া সেই সংবাদ পরিবেশন করে এই প্রথম তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। শ তাঁহার বাল্যজীবনের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বলিয়াছেন "কোন কোন ব্যক্তি আমাদের গৃহে আসিয়া আদর করিয়া আমার মাথা ও পিঠ চাপড়াইতেন। তাঁহারা স্বভাবতঃই মনে করিতেন যে ইহাতে আমি সাতিশয় প্রীতিলাভ করিতেছি। কিন্তু বলিতে কি আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তাঁহাদের এই অন্যায় হস্তক্ষেপে আমার শরীর রাগে জ্বলিয়া যাইত।" বাল্যকালে জোর করিয়া শ'কে অন্যান্য খৃষ্টান ছেলেমেয়েদের মত প্রার্থনা করান হইত। এই সম্পর্কে উত্তরজীবনে তিনি বলিয়াছেন "প্রত্যেক রবিবারেই আমাকে জোর করিয়া গির্জ্জায় লইয়া যাওয়া হইত। উত্তম পোষাকে সজ্জিত হইয়া একটা অন্ধকার গৃহে সুস্থ ও সবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে আমার দম বন্ধ হইয়া যাইত। আমি সর্ব্বদাই ভাবিতাম যখনই আমি বড় হইয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিব তখনই আমার প্রথম কার্য্য হইবে গির্জ্জা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাওয়া।"

এই বাধ্যতামূলক উপাসনা শ'য়ের মনে বোধ হয় গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। কারণ "একদিন আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে আমার মৃত্যু হইয়াছে। আমাকে বিচারের জন্য স্বর্গে সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট আনা হইয়াছে। ভগবানের ঘরের ঠিক সম্মুখে একটা বেঞ্চিতে আমাকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে; শীঘ্রই ডাক পড়িবে।

এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, প্রত্যেক রবিবারে গির্জ্জায় যে সুন্দরী মহিলাটী আমার পাশে বসেন তিনি হাস্যমুখে আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। তিনি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন এবং ভগবানের নিকট আমাকে লইয়া যাইতেছেন বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু এমনি প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য যে যেইমাত্র আমরা ভগবানের ঘরের চৌকাঠে আসিলাম তখনি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অল্পের জন্য ভগবানকে চাক্ষুষ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমার ভয়ানক অনুশোচনা হইল।" উপাসনার প্রতি এই বিরূপতা শ জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

এইবার আসিল বিদ্যারম্ভের পালা। শ খুব ভাল লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হোন এই ছিল তাঁহার মায়ের একান্ত ইচ্ছা। তিনি তাঁহাকে জনৈক নামকরা ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত এক স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্কুলে জীববিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সৌরতত্ত্ব এবং গ্রীক হইতে আধুনিক আরমেনিয়ান পর্য্যন্ত কোন কিছু শিখানই বাদ যাইত না। ঐ শিক্ষক ভদ্রলোকটি ছিলেন একজন পাকা ব্যবসাদার। তিনি শুধু ভড়ং ভাড়ং এবং বিজ্ঞাপন দ্বারা অভিভাবকগণকে ভুলাইতেন। শ অতি শীঘ্রই এই শিক্ষকের আসল রূপটী ধরিতে পারিলেন। তিনি স্কুলে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে জোর করিয়া পাঠান হইতে লাগিল। এই সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া শ বলিয়াছেন যে স্কুলগুলি ছেলেদের জন্য চালান হয় না। শিক্ষক এবং পিতামাতার স্বার্থের খাতিরেই এইগুলি চলিয়া থাকে।

শিক্ষকের অর্থের দরকার এবং পিতামাতা সব সময় ছেলেদের সঙ্গ পচ্ছন্দ করেন না। অথচ তাঁহাদের ইচ্ছা ছেলেরা মানুষ হোক্। শ'কে এই স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া অন্য দুই একটি স্কুলে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোথায়ও তিনি কয়েক মাসের বেশী টিকিতে পারিলেন না। শয়ের স্কুলের শিক্ষা এইভাবে সমাপ্ত হইল।

শ যে অতি শৈশব হইতেই কিরূপ কৌতুক ও কৌতূহল-পরায়ণ ছিলেন তাহা এই ঘটনাটী হইতে বুঝা যাইবে। শকে গৃহে একজন যুবতী মহিলা পড়াইতেন। শয়ের মাথায় কোনদিনই অঙ্ক ঢুকিত না। তিনি ইহার একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুণ অঙ্ক শিখাইবার সময় মহিলাটী বলিতেন 'থ্রি ইনটু টু'। শ থ্রি ও টু কথাটি বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু ইনটু কথাটি কেন যে এখানে আসিল তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেন না; শিক্ষায়িত্রীও ইহা তাঁহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। ফলে শ গুণ অঙ্ক শিখিতে পারিলেন না।

এই শিক্ষয়িত্রী এবং যাবতীয় শিক্ষক ও গির্জ্জার পাদরীদের নিকট হইতে শ জানিতে পারিয়াছিলেন যে ভগবান একজন প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ভদ্রলোক। রোমান ক্যাথলিকদের তিনি দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। তাহারা মরিয়া নরকে যায়। শ মাঝে মাঝে রোমান ক্যাথলিকদের এই দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন। ধর্ম্মের নামে এই ভণ্ডামিও শ'কে ভগবানের প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে নিরীশ্বর-বাদিতার বীজও এইখানেই উপ্ত হইয়াছিল।

বালকসুলভ চপলতাও শ'য়ের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। একবার তিনি ও তাঁহার এক বন্ধু বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলেন। পাশের বাড়ীর এক ঝি পেরাম্বুলেটারে করিয়া একটি শিশুকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। কি একটা প্রয়োজন হওয়ায় ঝি পেরাম্বুলেটারটী রাস্তায় রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। শ'য়ের মাথায় এক দুর্ব্বুদ্ধি চাপিল। তিনি ও তাঁহার বন্ধু ছুটিয়া গিয়া প্রচণ্ড বেগে পেরাম্বুলেটারটী ঠেলিতে লাগিলেন এবং তীব্র গতিবেগের মধ্যে গাড়িটিকে ছাড়িয়া দিলেন। দিয়াই ছুট, ইহার পর হতভাগ্য শিশুর কি হইল এই খবর আর তাঁহারা লইলেন না। আরেক দিনের একটি ঘটনা "আমি একবার কোন আত্মীয়ের বাগান হইতে ডজন চারেক আপেল চুরি করিয়াছিলাম। বাগানের পাশেই বসিয়া আমি উহাদের সদ্‌গতি করিতেছিলাম। ডজন দুয়েক খাওয়ার পর আমার মনে হইল যে আমার স্বাস্থ্য এখনও বেশ দৃঢ় আছে, কাজেই আর খাওয়ার প্রয়োজন নাই। বরং সামনের মাঠে মুরগীগুলিকে আপেলগুলি দিয়া ঢিল মারা অনেক আমোদজনক হইবে।" মনের ইচ্ছা শ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিলেন।

(৩)

শ কোন ধরাবাঁধা নিয়মে পড়াশুনা করেন নাই। উত্তর-জীবনে একবার তিনি বলিয়াছিলেন "কি করিয়া যে আমি লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলাম তাহা আমার মনে নাই।" শ ছেলেবেলায়

ছেলেদের বই পড়িতে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। বড়দের বই পড়াই তিনি সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন। 'Arabian Nights,' ডিকেন্সের 'Great expectations,' এবং 'A tale of two cities' তিনি তাঁহার দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেকস্‌পিয়র এবং বাইবেলও তিনি সেই সময়ই পড়িয়া ফেলেন।

বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়িতে পড়িতে শ'য়ের মনে এক স্বকীয় কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি হইল। সেই কল্পনারাজ্যকে তিনি নানারূপ মনোরম চিত্রাদি দ্বারা সাজাইতে লাগিলেন। নিজেকে তিনি পৃথিবীর মহাযুদ্ধসমূহের বিজয়ীপক্ষের সেনাপতি এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের জয়ীপক্ষ বলিয়া মনে করিতেন। এই পৃথিবীতে তিনি যেন একক ; বন্ধু, স্বজন কেহই তাঁহার নাই। কিন্তু তিনি একাই মহামানব, কেহই তাঁহাকে কোন কিছুতে পরাস্ত করিতে পারে না। কল্পনারাজ্যের এই বীর একবার বাস্তবে কিরূপ নাকাল হইয়াছিলেন তাহা নিজের মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

একবার এই বীরপুরুষের এক ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে একটি ছেলে তাহার ছাগলটী জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। তৎক্ষণাৎ শ সেই হতভাগ্যকে শাস্তি দিতে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বীরপুরুষ ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এইখানে বীরত্ব খাটিবে না। কারণ সে অনেক বেশী শক্তি রাখে। কিন্তু ভক্তের সামনে পশ্চাদপসরণ করাও চলে না। আমাদের বীর বালক মহাফাঁপরে পড়িয়া

গেলেন। যা'হোক্ দর্পহারী ভগবান এইবার তাঁহাকে রেহাই দিলেন। কি জানি কি মনে করিয়া বড় ছেলেটী ছাগলটী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। ইহার পর কোন দিনই তিনি ভক্তের অনুরোধে শারীরিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে যান নাই।

শ বাল্যে অদ্ভুত রকমের কল্পনাবিলাসী ছিলেন। সঙ্গী বালকদের নিকট তিনি যত রাজ্যের মিথ্যা গল্প বানাইয়া বলিতেন এবং প্রত্যেক গল্পের নায়কই হইতেন তিনি নিজে। তাঁহার গল্প বলিবার ভঙ্গী এত চমৎকার ছিল যে তিনি যে মিথ্যাকথা বলিতেছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। এইভাবে তিনি এক প্রকাণ্ড ভক্তের দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সঙ্গীত ও নাটকের প্রতি বাল্যকাল হইতেই শ'য়ের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার মা একজন খ্যাতনাম্নী সঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ'য়েদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের প্রভাব সহজেই শ'য়ের উপর বিস্তারিত হয়। ছেলেকে সঙ্গীত শিখাইবার জন্য তাঁহার মায়েরও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কাজেই সঙ্গীতকলায় দীক্ষা নিতে শয়ের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। উত্তরজীবনে শ বহু সাময়িক পত্রিকায় সঙ্গীত সমালোচক হিসাবে কাজ করিয়াছেন। তাহার হাতেখড়ি এই বাল্যেই হইয়াছিল।

যে বয়সে ছেলেদিগকে অপেরায় লইয়া যাওয়া অপরাধজনক কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় শ'কে তাহার মা সেই বয়সেই অভিনয় দেখিতে লইয়া যাইতেন। প্রথম যেদিন শ থিয়েটার দেখিতে

গেলেন সেইদিনের স্মৃতি তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। অভিনয় যে কি জিনিষ তিনি তখনও তাহা জানেন না। সুসজ্জিত রঙ্গালয়ের এককোণে মায়ের সঙ্গে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন আর অবাক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইতেছেন। আস্তে আস্তে পরদা উঠিয়া গেল। বালক শ যেন তাঁহার কল্পনারাজ্যে পৌঁছিলেন। এরপর বহুবার তিনি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছেন কিন্তু প্রথম দিনের স্মৃতি আজিও তাঁহার হৃদয়ে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

শ'য়েদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার মায়ের উপরই সংসারের সমস্ত ভার আসিয়া পড়িল। ১৮৭২ সালে, শ যখন মোটে ১৬ বৎসরের বালক তখন তাঁহার মা তাঁহার দুই বোনকে লইয়া অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। এই সময় শ'য়ের এক বোন মারা যায়। অন্য বোন মায়ের মতই সঙ্গীত পারদর্শিনী ছিলেন। শ'য়ের মায়ের মনে এই আশা ছিল যে তিনি ও তাঁহার মেয়ে সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী হিসাবে কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

শ ও তাঁহার পিতা স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিয়া গেলেন।

(৪)

দারিদ্র্যের নিপীড়নে শ'য়ের পিতা বাধ্য হইয়াই শ'কে একটা কাজে ঢুকাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন। অনেক ঘুরাঘুরির পর এক আত্মীয়ের চেষ্টায় শ এক জমির দালালের অফিসে মাসিক ১৮ শিলিং মাহিনার এক চাকুরী পাইয়া গেলেন। অল্প বয়সের

ছোক্‌রার পক্ষে এইরূপ একটি চাকুরী পাওয়া তৎকালে সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হইত। কিন্তু যে ব্যক্তি নাকি উত্তরজীবনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী হইবেন তাঁহার পক্ষে এই চাকুরী মোটেই লোভনীয় নহে। এই সম্পর্কে শ বলিয়াছিলেন "আমি আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছিলাম।" প্রকৃতপক্ষে এই চাকুরীতে তিনি কোনদিনই মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। অফিসের কর্ত্তা যখন কাজে কর্ম্মে বাহিরে যাইতেন তখন শ সহকর্ম্মীদিগকে অভিনয় অথবা সঙ্গীতের কায়দা শিখাইতেন। একদিন যখন তিনি একজন সহকর্ম্মীকে সঙ্গীত শিখাইতেছেন তখন অফিসের কর্ত্তা হঠাৎ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সহকর্ম্মীটী তখন গলা ছাড়িয়া গান গাহিতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া কর্ত্তারতো চক্ষুস্থির। তিনি কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া নিজের কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন।

শ তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে ধর্ম্ম সম্পর্কেও উপদেশ দিতেন। ইহা জানিতে পারিয়া অফিসের কর্ত্তা তাঁহার অফিসকে ধর্ম্ম সম্পর্কিত বিতর্কসভায় পরিণত না করিতে শ'কে অনুরোধ জানাইলেন। ইহাতে অবশ্য অফিসের কর্ত্তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু শ ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিলেন। এই সময় ডাবলিনে এক প্রচারক আসিলেন। শ ঐ প্রচারকের এক সভায় গেলেন এবং সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া 'Public opinion' কাগজে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে জড়াইয়া এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রটী ১৮৭৫

সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত ইহাই শ'য়ের প্রথম লেখা। ইহার পূর্ব্বে অবশ্য শ বহু গল্প এবং প্রবন্ধ লিখিয়া বিভিন্ন সাময়িক পত্রে পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোনটিই মুদ্রিত হয় নাই।

লিখিবার প্রতি মনোনিবেশ করিলেও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ শ'য়ের তখনও কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহার মা ডাবলিনে কিছুদিন স্বাধীনভাবে থাকিয়া লণ্ডনে চলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার সময় তাঁহার পিয়ানোটী ফেলিয়া গিয়াছিলেন। শ'কে আর পায় কে? তিনি চব্বিশ ঘণ্টা ইহার পিছনে লাগিয়া রহিলেন। নূতন নূতন সুর আবিষ্কার করিয়া আবিষ্কারের আনন্দে নিজেই মোহিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু উৎসাহ বেশীদিন রহিল না।

মা লণ্ডনে চলিয়া যাওয়ার পর শ'ও বেশীদিন ডাবলিনে ছিলেন না। তাঁহার ডাবলিন ত্যাগের ঘটনাটি বড়ই চিত্তাকর্ষক। জগতের বড় বড় মণীষিদের চরিত্র হঠাৎ এইরূপ ছোটখাট ঘটনার মধ্যে দিয়াই প্রস্ফুটিত হয়। ঘটনাটি এইরূপ :--

অফিসে শ'য়ের তখন যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মাসে তখন ত্রিশ শিলিং করিয়া তিনি পান। এই সময় হঠাৎ তাঁহাদের অফিসের ক্যাশিয়ার উধাও হয়। অফিসের একজন সিনিয়র ক্লার্ককে ক্যাশিয়ার করিয়া দেওয়া হইল। সেই ভদ্রলোক এই দুরূহ কর্ত্তব্য ভার বেশীদিন বহন করিতে পারিলেন না। সব শেষে শ'য়ের ঘাড়ে এই কার্য্যভার চাপান হইল। শ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। শ

মিথ্যাকথা বলিতে কখনই ইতস্ততঃ করিতেন না এই কথা সত্য, কাজে ফাঁকি দিতেন তাহাও ঠিক, কিন্তু তিনি কোন সময়েও অসাধু ছিলেন না। কাজেই কর্ত্তাব্যক্তিরা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাহিনা মাসে ৬০ শিলিং করিয়া দিলেন; কিছুদিন পরে এই অঙ্ক আরও বাড়ান হইল। শ'য়ের এই উন্নতিতে তাঁহার দারিদ্র্য রোগগ্রস্ত পিতা অত্যন্ত সুখী হইলেন। কিন্তু ক্যাশিয়ারি করিতে তো আর শ জন্মগ্রহণ করেন নাই। একদিন শ কাজ করিতেছেন এমন সময় তাঁহার এক সহকর্ম্মী একটা অতি সাধারণ কথা বলিল। কথাটি হইতেছে এই যে প্রত্যেক যুবকই মনে করে যে দুনিয়াতে কোন একটা মহৎ কাজ করিবার জন্য সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সে একদিন না একদিন বড় হইবেই। কথাটা শ'য়ের মনে একেবারে গাঁথিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন হয়তো ইচ্ছা করিলেই 'আমি বড় হইতে, মহৎ হইতে পারি'। ইতিপূর্ব্বে শ কোনদিনই ভাবেন নাই যে তিনি পৃথিবীতে কোন কিছু মহৎ কাজ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আজ শ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বড় তাহাকে হইতেই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিক করিলেন যে ডাবলিনে থাকিলে তাঁহার কিছুই হইবে না। তাঁহাকে লণ্ডনে যাইতে হইবে। লণ্ডনই একমাত্র স্থান যেখানে বড় হইবার সুযোগ রহিয়াছে। লণ্ডনে যাওয়ার মূলে আরও একটা কারণ ছিল। শ মনে করিতেন যে ডাবলিনই তাঁহার সকল দুর্গতির কারণ। তিনি ভাবিতেন যে তাঁহার দারিদ্র্য ও সকল ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে

ডাবলিন। "সকল আইরিশম্যানদের মত আমিও আইরিশদিগকে ঘৃণা কবিতে লাগিলাম।"

১৮৭৬ সালে শ লণ্ডনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি তাঁহাব মনিবকে কর্ম্মত্যাগেব অভিপ্রায় জানাইলেন। মনিব ভাবিলেন যে শ বুঝি আরও বেশী টাকা চান।। তিনি শ'কে আরও অনেক বেশী টাকা দিতে বাজী হইলেন। কিন্তু শ কিছুতেই ডাবলিনে থাকিতে রাজী হইলেন না। লণ্ডনে গিয়া শ যাহাতে একটা ভাল কাজ জুটাইতে পারেন তজন্য তাঁহার বাবা তাঁহাব জন্য একটি সুপাবিশ-পত্র যোগাড করিয়া আনিলেন। কিন্তু শ যে কেন ইহাতে মহা চটিয়া গেলেন তাহা তিনি বুঝিতে পাবিলেন না।

যাহা হোক্ ১৮৭৬ সালেব এপ্রিল মাসে শ লণ্ডনে আসিযা হাজিব হইলেন। তখন শ ২১ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে বার্ণার্ড শ'য়ের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। তাহার কাহিনী আরও রোমাঞ্চকর।

অদ্ভুত নয় কি ?

কেহ আমার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণত আমি বলিয়া থাকি "শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য, ১০নং সিন্দুরিয়া পটি, কলিকাতা।" আপাততঃ ইহা অপেক্ষা বিশদ ঠিকানার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি ধরা যায়, যে ব্যক্তি আমার ঠিকানা চায় সে কাশীপুর অঞ্চলের লোক, তাহাকে হয়ত জানাইতে হইবে "সিন্দুরিয়া পট্টি, বড়বাজার, উত্তর কলিকাতা।" লোকটি পাঞ্জাবের হইলে হয়ত আরও বলিয়া দিতে হইবে, কলিকাতা, বঙ্গদেশ।

এইভাবে সঠিক ঠিকানা দিতে দিতে মঙ্গলগ্রহের কোন অধিবাসীকে আমার ঠিকানা দিতে হইবে—

শ্রীনন্দদুলাল ভট্টাচার্য্য,
১০নং সিন্দুরিয়া পট্টি,
বড়বাজার,
উত্তর কলিকাতা,
কলিকাতা,
বঙ্গদেশ,
ভারতবর্ষ,
এসিয়া,
পৃথিবী,
—,

ঠিকানা প্রার্থী, পৃথিবী কোথায়, তাহা না জানিলে বলিতে হইবে পৃথিবী সৌর জগতের একটি গ্রহ। আবার এমন কেহ যদি থাকেন, যিনি সূর্য্য কোথায় তাহাও জানিতে চান, তবে বলিতে হইবে সূর্য্য অনন্ত আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি নক্ষত্র।

আকাশের যে সকল জ্যোতিষ্ককে আমরা চলতি কথায় নক্ষত্র বলি তাহারা প্রকৃতপক্ষে এক একটি সূর্য্য। অনেক দূরে রহিয়াছে বলিয়া উজ্জ্বল এক একটি বিন্দুর মত দেখি। আমাদের পৃথিবীতে আমরা দূরত্বের হিসাব করি মাইল ধরিয়া যেমন কলিকাতা হইতে দিল্লী মোটামুটি এক হাজার মাইল। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব মাইলের হিসাবে বলা চলে ৯৩ লক্ষ মাইল। ৯৩ লক্ষ মাইল দূরত্বের ধারণা করার শক্তি অবশ্য আমাদের নাই। পৃথিবী হইতে কোনও নক্ষত্রের দূরত্ব মাইলের মাপে করিতে হইলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কাগজ ভর্ত্তি করিয়া অঙ্ক লিখিতে হইবে। পৃথিবী হইতে নক্ষত্র, এক নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রের দূরত্ব মাপিতে বৈজ্ঞানিকেরা তাই চলতি মাপ মাইল ছাড়িয়া এক অদ্ভুত মাপ ধরিলেন। তাঁহারা তাহার নাম দিলেন "আলোক-বর্ষ"। অর্থাৎ আলোর রশ্মি এক বৎসরে যত পথ যাইতে পারে ততদূর। এভাবে দূরত্ব মাপ করা কিছু নূতন নয়। তবে হালে পাণি না পাইয়া বৈজ্ঞানিকেরাও শেষে এই পথ ধরিলেন, এইটুকুই যাহা ইহার নূতনত্ব।

সময় ও গতিবেগের সাহায্যে দূরত্বের মাপ নিরক্ষর লোকেরা

চিরকালই করিয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর লোকেরা এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামের দূরত্ব বুঝাইতে বলে এক দিনের পথ বা এক বেলার পথ। অর্থাৎ সমস্ত দিনে সে যদি বিশ মাইল পথ হাঁটিতে পারে, তবে দশ মাইল বুঝাইতে এক বেলার পথ বলে অথবা বিশ মাইল দূরত্ব বুঝাইতে একদিনের পথ বলে।

বৈজ্ঞানিকেরাও শেষে এই গেঁয়োলোকের পদ্ধতিতে দূরত্ব মাপিবার পন্থা পাইলেন। তবে, গেঁয়োলোকেরা এইভাবে মাপ করে তাহাদের জ্ঞানের অভাবে, আর বৈজ্ঞানিকেরা এ পথ ধরিলেন মাইলের হিসাবে কুলকিনারা পাইলেন না বলিয়া।

আমাদের জানাশুনার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতি হইল আলোর। আলো এক সেকেণ্ডে যায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। অর্থাৎ 'এক' গুণিতে আমাদের যতটুকু সময় লাগে তাহারই মধ্যে আলো সাত বার পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে।

এই 'আলোক-বর্ষে'র মাপে চন্দ্র পৃথিবী হইতে এক সেকেণ্ড দূরে, সূর্য্য সাড়ে আট মিনিট দূরে, আর আমাদের সবচেয়ে নিকটে যে নক্ষত্র আছে, তাহার দূরত্ব চার বছর। ধ্রুব নক্ষত্র হইতে আমাদের কাছে আলো আসিতে লাগে ৪৬৬ বৎসর। অর্থাৎ মোটামুটি ভাবে পাণিপথে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদির যুদ্ধের সময় ধ্রুবনক্ষত্র হইতে যে আলোকরশ্মি যাত্রা করিয়াছে, সেই আলোকরশ্মি এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি। কথাটা অন্য একভাবেও বলা চলে। আজ যদি কোন কারণে ধ্রুবনক্ষত্র নিভিয়া যায়, তাহা হইলে প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত আমরা

পৃথিবী হইতে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিব না। আমাদের চোখে তাহার আলো নিভিয়া যাইবে পাঁচ শত বৎসর পরে। ব্যাপারটা কি রকম, অন্য উদাহরণ দিয়া বলিতেছি।

এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লা, আঙ্গুলের ডগা দিয়া ছুইলে, ছোঁয়া মাত্রই ছেঁকালাগার জ্ঞান হয় না। আঙ্গুলের ডগা হইতে স্নায়ু বাহিয়া সে খবর মস্তিষ্কে পৌঁছিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় পরে ছেঁকালাগা বুঝিতে পারি। ধরিয়া লইলাম এই সময়টুকু এক সেকেণ্ডের এক শত ভাগের এক ভাগ। আঙ্গুলের ডগা হইতে মস্তিষ্ক দুই বা আড়াই হাত দূরে। আঙ্গুলের ডগা যদি শ্যামবাজারে থাকিত, আর মস্তিষ্ক থাকিত কালীঘাটে, তাহা হইলে যে সময়ে হাত পুড়িত, তাহার পাঁচ মিনিট পরে বুঝিতে পারিতাম আমার হাত পুড়িয়াছে। এইভাবে দূরত্বের মাত্রা বাড়াইয়া গেলে, আজ হাত পুড়িলে কাল তাহা জানিতে পারিব।

বিশ্ব ও তাহার অন্তর্গত কোটি কোটি নক্ষত্র, অর্থাৎ কোটি কোটি সূর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের সূর্য্য ও তাহার তৃতীয় গ্রহ এই পৃথিবীর একটু খবর লইয়া দেখা যাক।

পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। একবার প্রদক্ষিণ করিতে তাহার এক বৎসর লাগে। প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পৃথিবী যে বেগে ছুটিতেছে তাহা ঘণ্টায় সত্তর হাজার মাইল, অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে বিশ মাইল। বন্দুকের গুলি যে বেগে ছোটে তাহা হইতে অনেক বেশী বেগে। তাহা হইলে, আমরা,

যাহারা পৃথিবীর বাসিন্দা তাহারও সেই সঙ্গে এই বেগে আকাশ পথে ছুটিতেছি। পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকজন, ঘোড়া গরু, পাহাড় পর্ব্বত, বাড়ী ঘর দুয়ার সমস্তই সেকেণ্ডে বিশ মাইল বেগে ছুটিতেছে, তবুও কেহ পৃথিবী হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া যাইতেছে না। এমন কি চন্দ্র, যিনি পৃথিবীর বাহিরে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে এই বেগে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছেন তিনিও ছিট্‌কাইয়া যাইতেছেন না। এমন একটা ভেল্কি কি করিয়া সম্ভব হইতেছে।

পণ্ডিতেরা বলিলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নামে এক অদৃশ্য শক্তিই এই ভেল্কি সম্ভব করিতেছে। মাধ্যাকর্ষনের প্রভাবেই এই গোটা বিশ্বের কাহারও কক্ষচ্যুত হইবার জো নাই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে আমরা দেখিতে না পাইলেও সেই জবরদস্ত্ শাসকের শাসনে যে যাহার পথে চলিতেছে কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষ হইতেছে না।

মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেই সকল জিনিষের একটা ওজন রহিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে কিছুরই আর ওজন থাকিত না। পৃথিবী পৃষ্ঠের যাবতীয় কিছু যেমন তেমন করিয়া এখানে ওখানে ভাসিয়া বেড়াইত। একখানা পাথর ছুড়িয়া দিলে তাহা আর মাটিতে পড়িত না। প্রকাণ্ড একখানা রেলওয়ে ট্রেণ বেলুনের মত হাওয়ায় ভাসিতে থাকিত। আমরাও আর মাটির উপর চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিতাম না। চায়ের পেয়ালায় চা

ঢালিতে গেলে তাহা পেয়ালায় না পড়িয়া উপর মুখো উঠিয়া যাইত। বই পেন্সিল খাতা কলম—চেয়ার—টেবিল সমস্তই যেমন তেমন করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত। ক্ষণকালের জন্যও যদি মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতা শিথিল হয়—তাহা হইলে সেই ক্ষণকালের মধ্যেই এই সুশৃঙ্খল বিশ্বে লণ্ডভণ্ড বাধিয়া প্রলয় ঘটিয়া যাইবে।

এরূপ কল্পনা ভয়াবহ সন্দেহ নাই। তবে ভরসা এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোনও এক মুহূর্ত্তে শিথিল হইতে পারে বা একেবারে অন্তর্দ্ধান হইতে পারে এমন কোন সম্ভাবনার আশঙ্কা কোন বৈজ্ঞানিকই এ পর্য্যন্ত করেন নাই।

দার্শনিককে প্রশ্ন করিলে হয়ত তিনি বলিবেন 'হাঁ' ও বলিতে পারি না, 'না'ও বলিতে পারি না।

কাহিনী নহে—

শ্রীকুমারেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ফেডর্ ডষ্টয়েভস্কি রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই তাঁহার গ্রন্থসমূহের অনুবাদ হইয়াছে। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যাঁহারা রাশিয়াকে মধ্যযুগীয় অত্যাচারীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিলেন ডষ্টয়েভস্কি তাঁহাদের একজন। ডষ্টয়েভস্কির জীবনকাহিনী বড়ই বিচিত্র। একবার মাত্র তিন মিনিটের জন্য তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। সেই ঘটনাই বলিতেছি।

একবার রাশিয়ার শাসনকর্ত্তা জার একদল বিপ্লবীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ডষ্টয়েভস্কিও এই দণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন। বন্দীদিগকে লাইন করিয়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল এবং পর পর এক একজনকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল। এক একজনের প্রাণ লইতে সময় লাগিতেছিল এক মিনিট করিয়া। ডষ্টয়েভস্কি ছিলেন লাইনের ৫৮তম ব্যক্তি।

৫৫তম ব্যক্তি পর্য্যন্ত ফাঁসি হইয়া গেল। শঙ্কাকুল অসহায় জনতা সজল চক্ষে ডষ্টয়েভস্কির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে; তাঁহার পালা আসিল বলিয়া।

এমন সময় জারের আদেশ আসিল অবশিষ্ট বন্দীদের প্রাণ বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষি বাঁচিয়া গেলেন।